উত্তরে বাংলার মুক্ত কণ্ঠ

এখন ডুয়ার্স

৫ বছর পেরিয়ে

জুন ২০১৯। ২০ টাকা

জল। জঙ্গল। জনসত্ত্বা

নির্বাচন রাজনীতির পাচন।

যো জিতা ওহি সিকান্দর

শোধরাবেন? নাকি ছাড়বেন?

সবুজ বাগিচায় কেন গেরুয়ার রং

ভোটের লড়াইয়ে ব্রেন হ্যাকিং

দু' কোটি নারীর ভোটাধিকার নেই

বড় গল্প। ফিমেল সার্জিকাল ওয়ার্ড

উত্তরের আকাশে এ কোন বর্ষা আসে?

এরকমটা নাকি হওয়ারই ছিল? গেরুয়া মেঘে ঢেকে গিয়েছিল সবুজ ডুয়ার্সের কালবৈশাখী আকাশ! তারপর দমকা ঝড়ে উড়ে গেল বানজারাদের তাঁবু। যাদের জন্ম এ মাটিতে নয়, যারা তারপর ক্রমে দখল নিয়েছিল উত্তরের তালুক ও কারবার। তাদের জমানার অন্তিমকাল ঘোষণা হল উত্তর বাংলায়। একবার সুযোগ পেলেই পরজীবিদের ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বাঁচতে চায় মানুষ, এসময় বড় দয়াহীন হয়ে ওঠে তারা।

এখন ডুয়ার্স **সম্পাদকের চিঠি**

উত্তরের অভিবাদন ! অভিনন্দন উত্তরবঙ্গ !

চল্লিশ বছরের প্রাজ্ঞতায় পৌঁছে গিয়েছে উত্তরের আত্মার আত্মীয় 'উত্তরবঙ্গ সংবাদ'। গত দশ বছরে কলকাতার বাণিজ্যিক 'ঢপের চপ' উত্তরবঙ্গ সংস্করণগুলি সমবেতভাবেও যার ধারে কাছে পৌঁছতে পারেনি। হাজার রকম প্রচেষ্টাতেও ধরতে পারে নি উত্তরের স্নায়ুতন্ত্র ও মনন। আসলে এই পত্রিকার ভিতে রয়েছে উত্তরের হাজার সৈনিকের লড়াই, উত্তরের লক্ষ লক্ষ জনগণ মন। আজ শিরদাঁড়া সোজা রেখে সংবাদ পরিবেশনে তার নিরপেক্ষতা কলকাতার অভিজাত সংবাদপত্রকুলকে লজ্জায় পেছনে ফেলে দিতে পারে। আমাদের 'উত্তরবঙ্গ সংবাদ'। সাবাস বড়ভাই ! 'এখন ডুয়ার্স'এর অভিনন্দন !

চল্লিশের কোঠা পার করেছে উত্তরের আর এক প্রতিষ্ঠান 'উত্তরবঙ্গ ক্ষেত্রীয় গ্রামীণ ব্যাঙ্ক'। উত্তরের চার জেলায় শ'দেড়েক শাখা আজ সীমিত লোকবল নিয়েও সজীব। বিবিধ সরকারি অনুদান-ঋণের ঝড় সামলেও বাণিজ্যে বাকি ব্যাঙ্কগুলির সঙ্গে পাল্লা দেয়। নানা প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও উত্তরবঙ্গের মানুষকে পরিষেবা দিয়ে চলেছে, এখানে এমন কোনও মানুষ বোধহয় নেই যিনি গ্রামীণ ব্যাংকের কোনও না কোনও কর্মীকে চেনেন না। 'এখন ডুয়ার্স'-এর ব্যাঙ্কও স্বভাবতই 'উত্তরবঙ্গ ক্ষেত্রীয় গ্রামীণ ব্যাঙ্ক'।

উত্তরের আরেক মহীরুহ 'উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগম' সবার অলক্ষ্যে পঁচাত্তরে পা দিয়েছে। টানা শোষণে রিক্ত উত্তরবঙ্গের লাইফ লাইন এনবিএসটিসি তবু গত কয়েক বছরে বেঁচে উঠবার আশায় ঘুরে দাঁড়াবার বার্তা দিয়েছিল। আজও রোজ সকালে মহানগরের পথে উত্তরের এক রাশ বাতাস পৌঁছে দেয়, শিলিগুড়িকে ঘুম থেকে ডেকে তোলে 'উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগম'-এর বাস। দিন ও রাত এক করে ছুটতে থাকে উত্তরের মানুষের ভরসায়। উত্তরের প্রান্তে পৌঁছে দেয় এখন ডুয়ার্সের আশা।

সত্তরের ধৈর্যসীমায় দাঁড়িয়ে তাই এবার আগেই পরিবর্তনের ডাক দিল উত্তর। অবাক দক্ষিণ চোখ তুলে দেখে এবার এগিয়ে থাকতে চায় উত্তর বাংলা। পুবের আলো এসে ভাসিয়ে দিচ্ছে, ঘুম ভাঙছে উত্তরের। হারানো প্রাচীন আত্মীয়স্বজনদের খুঁজে নেওয়া এখন সহজ, অবাধ মৃগয়াভূমিতে লুঠেরাদের এখন চিহ্নিত করা অনেক সহজ। চির তস্করের দল এইবেলা শুধরে যাক কিংবা পুড়ে খাক হয়ে যাক মানুষের ঘৃণায়।

ভাল থাকবার চেষ্টা করবেন সবাইকে নিয়ে।

প্রদোষ রঞ্জন সাহা

এখন ডুয়ার্স পত্রিকা প্রাপ্তিস্থান

শিলিগুড়ি
বিশ্বাস বুক এজেন্সি, বাটা গলি, হিলকার্ট রোড ৯৪৩৪৩২৭৩৪২
শিবমন্দির
অনুপ দাস, শিবমন্দির বাজার ৯৮৩২০২৯৫১৪
জলপাইগুড়ি
ভবতোষ ভৌমিক, কমার্স কলেজের বিপরীতে ৯৭৩৩২৪৬৯১৩
মালবাজার
সম্রাট (হোম ডেলিভারি) ৯৩৩২০০৫৮৬৫
চালসা
দিলীপ সরকার, চালসা মোড় ৯৭৭৫৪১৫১৪৪
বিন্নাগুড়ি
রমেশ শর্মা, সিটি বুক স্টল ৯৪৩৪৮০৯৫৯০
বীরপাড়া
বরুন ঘোষ, পোকিসা ৯৫৯৩৩৫৪১৫২
মাদারিহাট
জগৎ চৌধুরী (হোম ডেলিভারি) ৯৭৪৯৭২৫৭৮১
লাটাগুড়ি
সৌমেন (হোম ডেলিভারি) ৯০০২৪০৯৮৯৩
ময়নাগুড়ি
দেবাশিষ বসুভাট ৯৯৩৩১৯০৮৫৮
ফালাকাটা
অমল চন্দ্র পাল ৯৪৩৪৪১২৬৪৯
তুফানগঞ্জ
আনন্দবাজার বুক স্টল ৯৩৩৩৬৮৮৬৭১
দিনহাটা
হরিপদ রায় ৯৯৩২৬৩৯০৬৮
আলিপুরদুয়ার
দীপক কুমার হোড়, কলেজ হল্ট ৭৬৭৯৮৯৫৩০৭
কোচবিহার
জয়ন্ত দাস, বড় পোস্ট অফিসের বিপরীতে ৯৪৩৪২১৭০৮৪
মালদা
অমিত কুমার দাস, পুষ্প নিউজ এজেন্সি ৯৯৩২৯৬৭৯৯১
বালুরঘাট
মাধববাবু ৯১২৬২৬০৬৬৩
ইচ্ছুক এজেন্টরা যোগাযোগ করুন ৯৮৩০৪১০৮০৮

কলকাতায় এখন ডুয়ার্স পরিবেশক বিশাল বুক সেন্টার ৪০৬৪৪০৯৭

এখন ডুয়ার্স-এ লেখা পাঠান হাতে লিখে নয়, টাইপ করে

ডুয়ার্স সংক্রান্ত আপনার কোনও লেখা থাকলে টাইপ করে পাঠান। আপনার লেখা সম্পাদকমন্ডলীর পছন্দ হলে এই পত্রিকায় তা ছাপা হবে। লেখার বিষয়বস্তুর উপর ছবি থাকলে অবশ্যই পাঠাবেন।

লেখা পাঠানোর ঠিকানা এখন ডুয়ার্স। শান্তি পাড়া। অনিমা লজের পেছনে।

জলপাইগুড়ি ৭৩৫১০১। অথবা মেল করতে পারেন নিচের মেল আইডি-তে

editor.ekhonduars@ yahoo.com

এখন ডুয়ার্স

ডুয়ার্সের নিজস্ব বই ও পত্রিকা

পরিবেশ | পরিকাঠামো | পর্যটন
জঙ্গল | জনসত্ত্বা
শিক্ষা | স্বাস্থ্য | সাহিত্য | সংস্কৃতি

জায়গা ছেড়ে দিতে হবে নয়া প্রজন্মকে। হাসছে এবার নবীন ডুয়ার্স।

এখন ডুয়ার্স

ষষ্ঠ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, জুন ২০১৯

সম্পাদনা ও প্রকাশনা
প্রদোষ রঞ্জন সাহা

ডুয়ার্সের ব্যুরো প্রধান
শুভ্র চট্টোপাধ্যায়

সহকারী সম্পাদনা
শ্বেতা সরখেল

অলংকরণ
শান্তনু সরকার

সার্কুলেশন
দেবজ্যোতি কর
দিলীপ বড়ুয়া

মুদ্রণ অ্যালবাট্রস

ইমেল
ekhonduars@yahoo.com

প্রচ্ছদ দীপেশ গুরাও

ডুয়ার্সে ব্যুরো অফিস।
অনিমা ভবন। শান্তি পাড়া।
জলপাইগুড়ি ৭৩৫১০১

এখন ডুয়ার্স পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তুর দায়িত্ব পত্রিকা কর্তৃপক্ষের নয়। যে কোনও প্রকার আইনি ব্যবস্থা কলকাতা এলাকার মধ্যে হতে হবে। এই সংখ্যায় বেশ কিছু ছবি বিভিন্ন ওয়েবসাইট থেকে নেওয়া হয়েছে। তাদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ।

এই সংখ্যায় যা আছে

সম্পাদকের চিঠি ২

বইপত্রের ডুয়ার্স

বিমল লামা কথা সাহিত্যে প্রান্তজ স্বর ৬

পাঠকের চিঠি

জলপাইগুড়ি শিলালী নাট্যম ঃ কিছু তথ্য ৭

রাজনীতির পাচন

যো জিতা ওহি সিকান্দর ৯

উত্তরে কি শোধরাবেন? নাকি ছেড়ে দেবেন? ১২

সবুজ বাগিচায় কী করে ধরে গেরুয়ার রং ১৫

নির্বাচনে নাকি ব্রেন হ্যাকিং! ১৮

পর্যটন

বউ সাথে পথে পথে ২০

শ্রীমতি ডুয়ার্স

এবারের নির্বাচনে ভোটার তালিকায় নেই ২.১ কোটি নারী! ২৩

সাবিত্রী কাহিনি ২৫

আমার মেয়েবেলা ৩৭

গল্প

ফিমেল সার্জিকাল ওয়ার্ড ২৬

ধারাবাহিক ডুয়ার্স

মহারাণী কথা ৩০

যে শরীর ডাউনলোড হয় ৩৩

নিয়মিত বিভাগ

ফেসবুক পোস্ট ৪

খুচরো ৮

রাসায়নিক রস ৩৮

সেরা পোস্ট

তুহিন শুভ্র মন্ডল
১১ মে

দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার জন্য 'ট্রি ওয়ারিয়র' বা 'গাছ যোদ্ধা' নামে একটা গ্রুপ করছি।

আগামীতে সবুজ বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা নতুন করে বোঝানোর কিছু নেই। শুধুমাত্র গাছে যাদের আগ্রহ আছে তারা এখানে বা ইনবক্সে জানান। হোয়াটস অ্যাপ নম্বর দিন। কিন্তু নম্বর দিয়ে লেফট করবেন এমন কেউ একদম দেবেন না।

এখানে নাও জানাতে পারেন। নিজেরা একসাথে হয়েও নিতে পারেন উদ্যোগ।

আসুন শহর ও জেলাকে সবুজ করি। জেলাকে প্রখর তাপপ্রবাহ ও মরুকরণের হাত থেকে রক্ষা করার চেষ্টা করি।

বাস্তব কঠিন। কিন্তু সেই কঠিন জমিতে দাঁড়িয়েই আসুন লড়াই করি।

নীচের ছবিটির গাছটিকে দিশারী ক্লাবের প্রতিটি সদস্য লড়াই করে বাঁচাতে পেরেছে, যার গাছের ছায়া এখন অনেকে পায়। অক্সিজেনের কথা ছেড়েই দিলাম। (অনেক গুলির মধ্যে একটি মাত্র, কয়েকটাকে বড় করেও পারা যায়নি।)

ভার্চুয়াল মন্তব্য কেউ করবেন না। যদি গাছের জন্য নিরন্তর লেগে থাকতে পারেন তবেই মন্তব্য করবেন।

মৃদুল শ্রীমানী
১১ মে

ছুটির সন্ধে। সান্ধ্য ভ্রমণের ছলে বাহির হইয়াছিলাম। ড্রাইভারকে আজ ছুটি দিয়াছি। রাত গড়াইলে দ্রব্যবিশেষের কারণে পা গুলি কিঞ্চিৎ টলটলায়মান। চোখেও খুব স্পষ্ট দেখিতেছি না। দূরে কাছের বোধ গুলাইয়া গিয়াছে। রাস্তায় বিশেষ কেহ নাই। এই পার্বত্য শহরে লোকে একটু ত্বরায় শয্যাগত হইয়া থাকে। সুতরাং পথ শুনশান। একটু দূরে ধূম্রকুণ্ডলীর ন্যায় কি যেন দাঁড়াইয়া আছে। উহা কি? দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া মাথা নাড়িতেছে। আমি কি ভুল দেখিতেছি? পাহাড়ি শহরটিতে উচ্চতার কারণে গাছগুলি সরল ঋজু ও স্বল্পশাখ। কাছে যাইব? একাকী ভয় লাগিতেছে। হে হোরেশিও, এখনো এই পৃথিবীতে এমন অনেক কিছু আছে, যাহার রহস্য তুমি সমাধানের যোগ্য নহ। তবু পুরুষকারে ভর করিয়া আগাইয়া গেলাম। গিয়া দেখিলাম ধূম্রকুণ্ডলী নহে। বৃক্ষও নহে। এক শালপ্রাংশু প্রৌঢ় ভদ্রলোক। সহসা আমার গাত্রত্বক কণ্টকিত হইয়া উঠিল। এ আমি কাহাকে সাক্ষাৎ করিতেছি? ইনি তো রাজা রামমোহন রায়! সম্বিৎ ফিরিবামাত্র দণ্ডবৎ হইলাম। আভূমি প্রণত হইবার পরে তিনি জানিতে চাহিলেন কে তুমি? বলিলাম, আমি বঙ্গ ভাষার একজন সেবক। তবে আপনার পদনখকণারও তুল্য নহি। তিনি উদার কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন কোথায় লিখিয়া থাক? সাময়িক পত্র না সংবাদপত্র?

বলিলাম ফেসবুকে নিয়মিত লিখি।

শালপ্রাংশু মহাভুজ কহিলেন ফেসবুক? বই লিখিয়া থাক?

বলিলাম, না না, পুস্তক নহে, উহা একটি সোশ্যাল মিডিয়া। অতি মাত্রায় জনপ্রিয়। কিছু লিখিলেই লাইক পড়িয়া থাকে। রাজা কহিলেন, জনপ্রিয় বুঝিলাম, কিন্তু লাইক কি বস্তু?

বলিলাম, পড়িয়া ভাল লাগিলে লাইক দিয়া থাকে। বেশি ভাল লাগিলে রক্তাভ হৃদয় চিহ্ন দেয়।

প্রৌঢ় আমার প্রগলভতায় বিরক্ত হইয়া বলিলেন রাখো রাখো, তোমাদের রক্তাভ হৃদয়। সেই মেয়েটাকে দেখিতে পাইলে আমি..

ভাবিলাম এই মহাপুরুষের তো মেয়েঘটিত কোনো কিছু কভু শুনি নাই।

বলিলাম, আপনি কোন ভদ্রমহিলার কথা বলিতেছেন?

বলিলেন, আরে আমি সতীদাহ প্রথা রদের জন্য এত করিলাম, আর ওই মেয়েটা বলে কি না তাহাদের বিধানসভায় ইহা পাশ হইয়াছে। না না, এভাবে চলিতে পারে না। তোমাদের যুগে তোমরা সাধারণ জ্ঞানের বিস্তর পিন্ডি চটকাইয়াছ। আর সহ্য করিব না। বিধানসভা প্রতিষ্ঠার বহু আগেই আমি আমার কর্তব্য সমাধা করিয়াছি।

আমি বলিলাম ওহ, এই ব্যাপার? ইহাতে আপনার ন্যায় জ্ঞানবান ও গুণবান ব্যক্তির চঞ্চল হওয়া সাজে না। আপনার সতীদাহ প্রথা রদ কি জিনিস বাঙালি ভুলিয়াছে। ইদানীংকার সংবাদপত্র দেখিবেন, ঘরে ঘরে স্বামী বর্তমানে সতীদাহ চলিতেছে।

রাজা বলিলেন সে কি? তোমরা শান্ত হইয়া বসিয়া আছ? কোনো আন্দোলন করিতেছ না?

বলিতে গেলাম মহাশয়, আন্দোলন করিব কি শুনিবার কেহই নাই। বড়জোর ফেসবুকে সহমর্মিতা জ্ঞাপন করিবে। খুব বেশি হইলে শেয়ার করিবে। কিন্তু গায়ে গতরে মাঠে ময়দানে নামার কথা বাঙালি চিরতরে ভুলিয়াছে।

তিনি আমার মাথায় হাত রাখিলেন। বলিলেন ভাবিও না। একদিন সকলি ফিরিবে।

নিজ মস্তকোপরি সেই মহাপ্রাণের স্পর্শ পাইয়া আমার আবেগের রুদ্ধ দুয়ার খুলিয়া গেল। ভেউ ভেউ করিয়া বেশ খানিকক্ষণ অশ্রুপাত করিলাম। একটু সম্বিৎ ফিরিতে দেখি একটি ছেঁড়া কাপড় লইয়া চোখের জল সামলাইতেছি।

মহাপুরুষের আলখাল্লাটি জীর্ণ হইয়াছিল। সেইটি তিনি আমাকে অশ্রুভারাক্রান্ত দেখিয়া দান করিয়া গিয়াছেন।

কৌশিকরঞ্জন খাঁ
৭ মে

বামপন্থীরা শূন্য, আসলে কে শূন্য পাবে?

রাজনীতির মতো সিরিয়াস বিষয়কে নিয়ে যখন খ্যাংরামি চুরান্ত পর্যায়ে পৌঁছয় তখনই বামপন্থীরা শূন্য পায়। বামপন্থী রাজনীতি করা মানে জীবন নিঙরে রাজনীতি করা। অনেক ত্যাগ স্বীকার করে রাজনীতি।

শাসকের রক্তচোখ থেকে বাঁচতে কখনো তাদের আন্ডারগ্রাউন্ডে চলে যেতে হয়েছে। রাজনীতি করতে গিয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে হয়েছে পরিবার থেকে। এই জীবন দিয়ে রাজনীতি অন্য কোন মতাদর্শে পাওয়া গেছে? জমির ফসলের তেভাগার দাবীতে কম রক্ত ঝরেনি! খাদ্য আন্দোলন, সমাজবদলের স্বপ্ন দেখা নকশাল আন্দোলন করতে গিয়ে মরতে হয়েছে কতজন কে। তাদের পরিবারগুলো কি গভীর সংকটে পড়েছিল সেই সময়।

আর আজ রাজনীতির মঞ্চে এসে চোখে সানগ্লাস লাগিয়ে, মুখে সানস্ক্রিন মেখে, তোয়ালে পেতে ভাঙা রিক্সায় উঠে ন্যাকামোর শেষ পর্যায়ে পৌঁছে তাদের ভোট ভিক্ষে করতে দেখা যাচ্ছে। কোনো রাজনীতির কথা নয়। রাজনীতিতে হায়ার করা এই সৌখিন মজদুরদের দাবী যেহেতু তাদের কেরিয়ার টালিগঞ্জের স্টুডিও পাড়ায় ফেলে রেখে এসেছেন অতএব তাদের ভোট দিয়ে উদ্ধার করতেই হবে। ভোট চাওয়ার এই তো অধিকার? মানুষের অধিকারের জন্য ভোট চাওয়া নয়, নিজের জন্য ভোট চাওয়া। আরেক প্রার্থী বলছেন মায়ের আত্মার শান্তির জন্য ভোট দিতে। এই সব মানুষগুলো যখন রাজনীতির আঙ্গিনায় নামে তখন রাজনীতি আর সিরিয়াস বিষয় থাকবে কি করে?

এই বাংলায় রাজনীতি করেছেন সুভাষ—অরবিন্দ—চিত্তরঞ্জন। আর আজ কাদের দেখা যাচ্ছে? সিনেমা জগৎ থেকে আসাটা দোষের নয় কিন্তু প্রার্থীকে তো রাজনৈতিক মনোভাবের হতে হবে? তাদের রাজনৈতিক কার্যকলাপ থাকতে হবে? সামাজিক তথা রাজনৈতিক আন্দোলনে অংশগ্রহণ করার নিজস্ব ইতিহাস থাকতে হবে। হঠাৎ করে সিনেমার পর্দা, গানের জগৎ, খেলার জগৎ থেকে এসে তারা রাজনীতির মঞ্চে দাঁড়িয়ে পড়ছেন। যে দলগুলো তাদের ভোটে দাঁড় করাচ্ছে তাদের একটা লক্ষ্য থাকে। আগাম পরিচিতির কারণে সিটটাও সহজে দখল হলো আবার অরাজনৈতিক হওয়ায় তাদের নিয়ে হ্যাপাটাও কম। ভোটে জিতে তারা তাদের নিজেদের কর্মজগতে ফিরে যাবে আর বাকি দিনগুলো দলের লোক যেমন খুশি চালাবে। এইভাবে ধীরে ধীরে রাজনীতির জগৎটাকে অরাজনৈতিক করে দিতে পারলে একটা লাভ আছে। মানুষকে বোকা বানানো সহজ হবে। মানুষ রাজনীতি, দাবীদাওয়া নিয়ে না ভাবলে কাজের চাপটা কমে আসে। গিমিক, চমকে মাতিয়ে দিয়ে ভোট এলে সহজেই বৈতরণী পার হওয়া যায়।

এত বছরের বাম শাসনে মানুষ কিন্তু এই রাজ্যে এইরকম রাজনীতিহীন রাজনীতি দেখেনি। কিন্তু এখন

দেখছে এবং তারা এই রাজনীতির বহিরাগতদের বিধানসভা-লোকসভাতে যেতে দিয়ে আখেরে নিজের এবং সমাজের ক্ষতি করছে। এরা না পারেন প্রশ্নোত্তর পর্বে, বিতর্কে অংশ নিতে, না পারেন এলাকার সমস্যার কথা লোকসভার সামনে তুলে ধরতে। ফলে বঞ্চিত হচ্ছে মানুষই।

গ্ল্যামার সর্বস্ব রাজনীতি, ধর্মীয় উন্মাদনার কাছে রাজনীতির মৌলিক বিষয়গুলো হেরে যাচ্ছে। মানুষ খেতে পেল কিনা? তার কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হলো কিনা? চাষী ফসলের ন্যায্য দাম পেল কিনা? আজ এসব আর রাজনীতির বিষয় নেই। রাজনীতির বিষয় হয়ে উঠছে কে কাকে মিষ্টি-কুর্তা উপহার দেন। রাজনীতির বিষয় হয়ে উঠছে ভোটে দাঁড়ানো মানুষগুলোর পাওয়ার মিল।

বামপন্থী রাজনীতিতে এই ভ্যালুলেস বিষয়গুলো কোনোদিনই স্থান পায় না। বামপন্থীরা নিজেদের নিশ্চিহ্ন করেও নীতির প্রশ্নে অনড় থেকেছে। পরমাণুচুল্লীর বিষয়ে আমরা দেখেছি। কি হত মেনে নিলে! অন্তত আজ তাদের ভোটের অংকে শূন্য পাওয়ার মতো অবস্থায় যেতে হতো না। কিন্তু তারা নীতির প্রশ্নে অনড় থেকে নিজেরা শেষ হয়ে গেছেন। মানুষের দৈনন্দিন সমস্যা, অধিকার আদায় করে আনার মতো লোকগুলো শূন্য পেলে আসলে কারা শূন্য পেল তাহলে?

তবে এখন সময় অন্য। দেশের অন্তঃসারশূন্য রাজনীতি বামপন্থীদের জোট গড়ে দিচ্ছে। এই নির্বাচনে আমরা অদ্ভুত জিনিস দেখছি। সিপিআই, সিপিআইএম, লিবারেশন, রেড স্টার, কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে মানুষের জোট গড়ে লড়ছে। যার যেখানে যতটুকু শক্তি বামপন্থায় সবটুকু ঢেলে দিচ্ছে। জিগনেশ, কানহাইয়া, উমার খালিদের মতো নতুন যুগের নেতারা বলছেন হাম সাথ সাথ হ্যায়। আর কি চাই? পেটোয়া সংবাদমাধ্যম যতই শূন্য দিক মানুষ দেখবে এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে বামপন্থীদের উত্থান। একটা সুসময়, একটা সুস্থ সময় আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে।

সৌগত পিন্টা ভট্টাচার্য
২১ মে
নির্মেদ

কানাকে কানা বলি না খোঁড়া কে খোঁড়া বলি না। কিন্তু মোটা কে? আমি যখন অনন্যাকে 'ভার্টিকালি চ্যালেঞ্জড' বলি, ও সকালে হাঁটার স্পিড বাড়িয়ে, রাত্রের খাওয়া কমিয়ে দেয় পুরো ব্যস্তানুপাতিক সম্পর্কে!

বাঙালি কিছুকাল আগেও রোগাকে রোগের প্রতিশব্দ বলেই ভাবত। কিন্তু যেদিন থেকে বাঙালির খাদ্যাভিধনে 'ডায়েট' শব্দটার আমদানি হল সেদিন থেকেই ক্যালোরির সঙ্গে বাঙালির কাপালও পুড়ল।

জগতের সকল প্রিয় খাওয়ার ত্যাগের সঙ্গে সে মেদ ঝরানোর সমানুপাতিক সম্পর্কে মেতে উঠল। যে বাঙালির ঠাকুর্দার নাম মাখনলাল, নাতিকে আদর করে ডাকেন নাড়ুগোপাল বলে, তাঁকে কিনা খেতে হবে সুগার ফ্রি সন্দেশ আর কোলেস্টেরল ফ্রি তেল! সকাল বেলায় লুচি সাদা আলুর তরকারির বদলে ওটস! চর্বিওয়ালা মাংস বাদ, তেল বাদ, আলু বাদ, ভাত বাদ, মিষ্টি বাদ! শুধু বাদ নয়, এই শব্দগুলো চোখে দেখা বা কানে শোনাও পাপতুল্য। থাকল শুধু ডাইটিসিয়ানের সাথে প্রেম। সেই প্রেমও যদি অম্লমধুর হত!

প্রতিটি বাঙালি যেমন স্বভাব কবি, তেমনি তারা নিজেরাই স্বশিক্ষিত ডাইটিসিয়ানও বটে। নিজেরাই নিজের সুবিধা মত ডায়েট ঠিক করেই ক্ষান্ত হয় না, অন্যকেও উৎসাহিত করে সেই পথে খাওয়ার জন্য। সকালে বাড়িতে পাতা টকদই আর শসা খেয়ে রাতে নিমন্ত্রণে রেড মিট বা শেষ পাতের আইসক্রিমকে পরমান্ন বোধ করে। বাঙালির পাপ বোধের ডাকনাম 'অকেশন'।

বাঙালির শিল্প সংস্কৃতি নির্মেদ ঝরঝরে হলেও, বাঙালির শরীর কিন্তু তা নয়। 'অকেশন বাড়িতে' ক্যালোরি গেইন করেই বাঙালি সেলফি তুলতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। প্রিয় কবিতার মতোই সে নিজেকে ছবিতে নির্মেদ, স্লিম প্রমাণ করতে চায়। নিজের ছবিকে এডিট করা তো আর নলেন গুড়ের রসগোল্লা খাওয়ার মত পাপ নয়!

বাঙালি ডায়েট এক জটিল দুর্বোধ্য সাপলুডো খেলা। বর্জিত মেদ ফিরে আসে অর্জিত হয়ে সাপের মুখে রোজ রোজ। সাপের মুখ থেকে যে স্পিডে আবার তৈলাক্ত ঘুঁটিটা শূন্যের ঘরে নেমে আসে, ততটা স্পিডেই কি রোজ অনন্যা হাঁটে সকাল বেলায়!

কৃতজ্ঞতা স্বীকার—অনন্যা ছাড়া বাকিদের নাম নাই বা বললাম!

সেমন্তী মিত্র
১৯ মে
বেঁকানো শিরদাঁড়া

বড্ড অবাক লাগলো, আজ উত্তরবঙ্গ দুঘন্টা লেট করে পৌঁছল, যথারীতি দেরী হচ্ছে দেখে লোকাল ট্রেনে না চেপে উবের বুক করলাম।

শিয়ালদহ উবের পার্কিং জোনে দাঁড়ালাম, গাড়ি আসলো আর চাপলাম, একটাই ট্রলি ছিল সাথে, একমিনিট লাগল উঠতে, পার্কিং জোন থেকে গাড়ি বেরোবে... ড্রাইভার আমতা আমতা করতে লাগলেন, 'পার্কিং হয়েছে, চার্জ লাগবে' বললাম, 'কিসের চার্জ? একমিনিট পার্কিং এ চার্জ?' ড্রাইভার চুপ।

ভাবলাম কত আর চার্জ হবে এক মিনিটে, যাইহোক বেরোনোর সময় গাড়ি দাঁড়ালো, ড্রাইভার বললো যে ৬০ টাকা পার্কিং চার্জ!

গাড়ি একমিনিট দাঁড়ানোর জন্য ৬০ টাকা পার্কিং চার্জ!!!!! ভারতের ই বিভিন্ন জায়গায় গেছি, শুধু অন্য রাজ্য বা শহর বলবো কেন কলকাতাতেই হাওড়া দিয়ে যে যাওয়া আসা করি তা ওলা উবেরের পার্কিং জোনে কোনো চার্জ তো লাগে না, এয়ারপোর্টে লাগে-একটা নির্দিষ্ট সময়ের থেকে বেশি সময় গাড়ি দাঁড়ালে পার্কিং চার্জ লাগে, সেজন্য একটা সময়ের স্লিপ ধরানো হয় প্রত্যেক ড্রাইভারের হাতে গাড়ির এন্ট্রি করার সময়।

ভাবছেন ৬০ টাকা, তারজন্য এত বক্তব্য??না কথাটা ৬০ টাকার নয়, কথাটা ন্যায্য অনায্যের.. এভাবেই কোনোদিন ৬০০/৬০০০/৬০,০০০ টাকা চাওয়া হবে, সেদিনও হয়তো.. যাইহোক আমরাই প্রতিবাদ করেছি, অন্য সব গাড়িই সুন্দর ৬০টাকা দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিল। দুজন শক্তিশালী লোক আমাদের গাড়িটাকে সাইড করিয়ে দিতে বলল, বললাম যে, 'পুলিশ কে ডাকুন' বলল, 'ডাকবো না, টাকা না দিলে গাড়ি নড়বে না', বললাম, 'আপনাদের অধিকর্তা কে ডাকুন তবে', বলল, 'আমরাই সর্বেসর্বা' কি একটা পায়োনিয়ার না কি গ্রুপের নাম বললো।

খেলা শুরু হল এরপর, উবের ড্রাইভার আমাদের বুকিং ক্যানসেল করবে জানালো, এরমধ্যে কলকাতা পুলিশ কে ফোন করলাম, উনি বললেন যে এটা রেল পুলিশের আন্ডারে, রেলপুলিশ কে ফোন করলাম, তিনি বললেন যে এটা কলকাতা পুলিশের আন্ডারে। হ্যাঁ ফোন করে যা বুঝলাম যে টাকাপয়সা কেন দিতে হচ্ছে এটা নিয়ে কোনো সঠিক জাস্টিফিকেশন নেই, তবে একে অন্যের কোর্টে বল ফেলে বেশ টেনিস খেলা চলছে!

এবার গেলাম পুলিশের কাছেই সরাসরি, উনিও নির্বিকার! বললাম যে আজ পশ্চিমবঙ্গের কোথাও এমন হয় না, আর হলেও পার্কিং চার্জ তো সময়ের সাথে সমানুপাতিক, তাহলে শিয়ালদহ ব্যতিক্রম কেন? উনি নিরুত্তর ছিলেন! কি দেশ না আমাদের??? হয়তো খুব ছোট ঘটনা বলে সবার মনে হতে পারে, কিন্তু সবাই কি নিরুত্তাপ। পুলিশ টি বললেন, 'আমি সব বুঝি, আমি অশিক্ষিত না' আমি একটাই কথা বলেছি, 'এই ৬০টাকা হয়তো খুব ই সামান্য দাদা, যেখানে এরজন্য আপনারা কোনো জাস্টিফিকেশন দিতে পারছেন না, একটা দিনে হাজার হাজার গাড়ি পার্কিং জোনে ঢুকছে, আর প্রত্যেকের থেকে অন্যায্য ভাবে ৬০ টাকা নিয়ে দিনে দুপুরে ডাকাতি করছেন, সেখানেই চুপ, আর সেই দেশে ধর্ষণ, খুন, চুরি, ডাকাতি এসব হবে এটাই তো স্বাভাবিক! রেপ হওয়া নির্যাতিতা এলেও বলবেন এটা আমার jurisdiction এ পড়ে না! তাই অন্য থানায় যান, এক থানা থেকে অন্য থানা...আরে এটাই তো' দেশে মানবিকতার আগে আইন, কিন্তু কোনো আইন নেই, বিচার ব্যবস্থা নিয়ে কোনো বক্তব্য নেই আমার। আজ তাই দেশে আরেকটা মৃত্যু হল, একটা মেয়ের, মানে একটা মেয়ের মরালিটি, দয়া মায়া, মানবিকতা এসব কিছুর, এসব কিছুর মৃত্যু মানে তো মানুষের ই মৃত্যু! তাই না??? হ্যাঁ মাত্র ৬০ টাকা, হ্যাঁ তারজন্য এতো লড়াই, মেরুদন্ড তো বেঁকেই গেছে, তবুও মনটা বিদ্রোহ করে— theory of elasticity... বাঁকানো মেরুদন্ডটাকে সোজা করবার জন্য।

হ্যাঁ গুন্ডা দুটোর ছবি আছে আমার কাছে, তবে এই পোস্টের পর হয়তো থানা থেকে তুলে নিয়ে যেতে পারে আমায়, তাই এখন আর আপলোড করলাম না।

বন্ধুদের সেরা পোস্ট

'এখন ডুয়ার্স' ফেসবুক প্রোফাইলে তালিকাভুক্ত বন্ধুদের পোস্ট থেকে বাছাই করা কিছু লেখা ও ছবি পত্রিকার পাতায় ছাপার পরিকল্পনা থেকেই এই বিভাগের আবির্ভাব। সেরা পোস্ট নির্বাচন একান্তই সম্পাদকীয় সিদ্ধান্ত। তবে পোস্টে কোনওরকম কলম চালানো হয় না। এমনকী বানানও অপরিবর্তিত রাখা হয়। নির্বাচিত পোস্ট ছাপার বিষয়ে বন্ধুকে সবসময় অগ্রিম জানানো সম্ভব হয় না। তাই আগে থেকেই অভিনন্দন জানিয়ে রাখি সবাইকে।

বই পত্রের ডুয়ার্স

বিমল লামা
কথা সাহিত্যে প্রান্তজ স্বর

বিমল লামা (৪ঠা জুলাই ১৯৬৮) সাম্প্রতিক কালের একজন গুরুত্বপূর্ণ কথা সাহিত্যিক। পুস্তক আকারে প্রকাশিত 'নুন চা চায়ের দেশের নুন কথা' বিমল লামার প্রথম উপন্যাস (২০১২) তাঁর দ্বিতীয় উপন্যাস 'রুশিকা' (২০১৬)। এই দুটি মুদ্রিত গ্রন্থের মাঝখানে বিমল ছোটগল্প, ছোট উপন্যাস, প্রবন্ধ ফিচারও লিখেছেন। এই দুটি বইয়ের মাঝখানে 'কয়েকটি গল্প' নামে গল্প সংকলন প্রকাশ করেছেন। দার্জিলিং পাহাড় থেকে পুরুলিয়ার জঙ্গল, সেখানকার প্রকৃতি, মানুষজন বিমলের লেখায় যে ছাপ ফেলেছে, তা তাঁর রচনার কৃতিত্বেরই সাক্ষর। 'নুন চা' আর্বিভাব লগ্ন থেকেই উচ্চ প্রশংসিত। বরেণ্য কথা সাহিত্যিক দেবেশ রায় বিমল লামার দুটি উপন্যাসেরই উচ্চসিত প্রশংসা করে দৈনিক সংবাদ-সাময়িক পত্রতে লিখেছেন। এই সময়ের বিশিষ্ট কথা সাহিত্যিকেরা সকলেই বিমলের লেখা সম্পর্কে অবহিত, তার পাঠকের সংখ্যাও কম নয়। বিমলকে স্বাগত জানিয়ে উভয়পক্ষই জানিয়েছেন— 'নুন চা' একটি নতুন ধরনের উপন্যাস। গত ৪ঠা জুন ২০১৬ 'কৃত্তিবাস' পত্রিকার উদ্যোগে স্বাতী গঙ্গোপাধ্যায়ের আহ্বানে কলকাতার কলকাতার জীবনান্দ সভাগৃহে একটি গল্প পাঠের আসর বসেছিল, সেখানে শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, স্বপ্নময় চক্রবর্তী, রবিশঙ্কর বল বিনোদ ঘোষাল, সাদিক হোসেনের সাথে বিমল গল্প পাঠ করেছেন। আমার কাছে এটা শুধুমাত্র একটি ঘটনা বা তথ্য নয়, এর সাথে বিমলের অবস্থান ও পাঠকপ্রিয়তার ও নিদর্শন মেলে।

বিমলের জন্ম দার্জিলিঙের সিংটাম চা-বাগানে। স্থানীয় টুর অপারেটররা টুরিস্টদের খুব হ্যাপিভ্যালি চা-বাগান দেখান। এই হ্যাপিভ্যালি চা-বাগানের নীচেই সিংটাম। কে জানে আগামী দিনে কেউ হয়ত ওই সিংটামের জুম চাষের ধাপকে দেখিয়ে বলবেন তাদের লেখক বিমল লামা এখানে জন্মেছিলেন। বিমল তাঁর নিজের জন্মকথা সম্পর্কে লিখেছেন— 'কতদিন দেখিনি চা-বাগান ঘেরা আমাদের সেই হিমালি গ্রাম। তারই মাঝামাঝি বাঁশবন ঘেঁষা আমাদের সাবেক ঘর। লাল মাটির দেওয়াল, লাল টিনের চাল। চারপাশ ঘিরে সাদা চুনের চওড়া পাড়। ঝুঁকে আসা বাঁশবনের ঝিরঝিরে ঘোমটা মাথার ওপর। দরজা খুললেই কাঞ্চনজঙ্ঘার আর্শি নগর। অলীক এক পড়শির মত যে বারবার থেকেছে ভাবনার ভেতর। অথচ কখনও পৌঁছানো যায়নি তাঁর কাছে। কখনও সে বিলীন হয়ে গেছে আকাশের ভেতর কখনও আকাশ আর মাটির মাঝে ভেসে থেকেছে তৃতীয় এক ভুবনের মত। গোটা পাহাড় আজন্ম এক লুকোচুরির ভেতর বেঁচে থেকেছে এই অলৌকিক হিমালচুলির সাথে। যতই অলীক মনে হোক তার বাস্তবতা, চেতনার ভেতর যে রয়ে গেছে, এমনকী আজকের এই পুরুলিয়ার সরকারি আবাসনের ছাঁচের ঘরের ভেতরেও।

পুরুলিয়ায় থেকে বিমলের মন পড়ে থাকে হিমালি গ্রাম সিংটামে। দার্জিলিং পাহাড় থেকে বিমলকে চলে

পাহাড়ের রাজনীতি, সমাজনীতির চালচিত্র, মানুষের সাথে মানুষের সম্পর্ক, সবমিলিয়ে দেশজ, প্রান্তজ মানুষের নিজস্ব কণ্ঠস্বর বিমল ফুটিয়ে তুলেছেন তার 'নুন চা'তে। গোর্খাল্যান্ড নিয়ে এই যে দীর্ঘ অমীমাংসিত আন্দোলন, তার মধ্যবর্তী সময়ে বেড়ে ওঠা যে প্রজন্ম বিমল তাদেরই একজন। এই প্রজন্মের মনন ও উপলব্ধির কথা বলেছেন বিমল

যেতে হয়েছিল চুঁচুড়ায়। সেখানকার স্কুল কলেজেই পড়াশোনা, তারপর বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরাজি ভাষা ও সাহিত্যে স্নাতকোত্তর পাঠ নিতে আসা। তারপর চাকরি, এই সময়ে তিনি পুরুলিয়ার ঝালদা ব্লক-১ এর ওয়েলফেয়ার অফিসার। পুরুলিয়ার সরকারি আবাসনেই তার বসবাস। বিমলের স্ত্রী বঙ্গতনয়া সোমা, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের কৃতী ছাত্রী। বাংলা ভাষা সাহিত্য আষ্টেপৃষ্টে জড়িয়ে রেখেছে পঁচিশ বছরের সুখী দাম্পত্যর পাহাড় ও সমতলের এই জুটিকে। বিমলের পছন্দের খাবার খিচুড়ি, কবিতা পড়তে ভালবাসেন, আর ভালবাসেন লালনের বাণীকে মনের মধ্যে গুনগুন করতে।

দার্জিলিং পাহাড় থেকে হুগলি হয়ে পুরুলিয়া। পাহাড় থেকে সমতল। সবুজ চা-বাানের হিমালি গ্রাম থেকে রুখুসুখু জমিজিতে, জঙ্গল। এই দীর্ঘ পরিক্রমায় যে অভিজ্ঞতা, জীবন বিমলকে পাহাড় থেকে সমতলে নিয়ে গেছে। বিমলের লেখালেখির মধ্যে সময়ের সাথে সাথে সেই সবই এসেছে। বিমলের জন্মের আগের থেকেই গোর্খাল্যান্ডের দাবিতে আন্দোলনের সূচনা। ১৯০৭-এ হিলম্যান অ্যাসোসিয়েশনের আন্দোলন— ১৯১৭, ১৯৩০, ১৯৩৪-এ অল ইন্ডিয়া গোর্খা লিগের আন্দোলন, ১৯৪৭-এ অবিভক্ত কমিউন্সিট পার্টির এ নিয়ে দাবিদাওয়া— তারপর প্রান্ত পরিষদ, জিএনএলএফ, সুভাষ ঘিসিং, গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা— বিমল গুরুং— সবই আছে বিমলের 'নুন চা'তে। গোর্খাল্যান্ডের দাবি আন্দোলন দীর্ঘদিনের, কিন্তু আজও তা অমীমাংসিত। পাহাড়বাসীর অনিকেত যন্ত্রণায় যা কখনও স্বপ্ন, কখনও বা দুঃস্বপ্ন, বিমলের 'নুন চা' নিয়ে আলোচনায় বলা হয়েছে 'Nun Cha, a sprawling Bengali Novel by Bimal Lama on the Gorkha Land Movement: one of India's most protracted violent, and in conclusive armed secessionist movements of all that have rocked post independence India, the Gorkhaland move has perhaps been the longest drawn, most volatile and inconclusive. (Chaiti Mitra/http://northeastern review.worldpress.com)

বিমলই প্রথম যিনি এই প্রসঙ্গটি নিয়ে পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস লিখলেন। 'নুন চা'-এর গুরুত্ব শুধু এই কারণেই নয় যে এই বাংলা উপন্যাসটি একজন নেপালি মানুষের লেখা বলে। অমীমাংসিত গোর্খাল্যান্ডের আন্দোলনের সঙ্গে বহু মানুষ জড়িয়ে আছে। তাদের সংগ্রাম-স্বপ্ন-হতাশার রক্তাক্ত দিনগুলিকে চিহ্নিত করেছেন বিমল। এর সাথে খুব সাধারণ মানুষরাও আছেন, চা-বাগানের শ্রমিক, পাহাড়ি গ্রামের সবজি যারা চক বাজারে বিক্রি করতে আসেন, তারা আছেন বিমলের উপন্যাসের চরিত্র হয়ে। রাই, লিম্বু, তামাং, কামী, দামাইস, গুরুং, মগর, ছেত্রীরা সবাই 'গোর্খা' এই একটি মাত্র পরিচয়ে পরিচিত হতে চেয়েছেন। আর্গেন, মিলান, পরম, কুন্দন, পেম্বারা সবাই চায় তাদের একান্ত নিজস্ব ভূমি 'গোর্খাল্যান্ড'। এই চাওয়াটুকু নিয়ে উত্তাল আন্দোলন, পাহাড়ের সহজ সরল মানুষদের মধ্যে বিভাজন, রাজনৈতিক নেতাদের সুবিধাবাদী মনোভাব। সব শেষে হতাশার গ্লানি, তন্নিষ্ঠ সমাজবিজ্ঞানীর মত বিমলের নিপুন বীক্ষণ 'নুন চা'তে উঠে আসে। পাহাড়ের রাজনীতি, সমাজনীতির চালচিত্র, মানুষের সাথে মানুষের সম্পর্ক, সবমিলিয়ে দেশজ, প্রান্তজ মানুষের নিজস্ব কণ্ঠস্বর বিমল ফুটিয়ে তুলেছেন তার 'নুন চা'তে। গোর্খাল্যান্ড নিয়ে এই যে দীর্ঘ অমীমাংসিত আন্দোলন, তার মধ্যবর্তী সময়ে বেড়ে ওঠা যে প্রজন্ম বিমল তাদেরই একজন। এই প্রজন্মের মনন ও উপলব্ধির কথা বলেছেন বিমল, হয়ত 'নুন চা'-এর কাহিনির চরিত্রগুলি কাল্পনিক কিন্তু ইতিহাসের ছায়াপাতটুকু সত্য।

'নুন চা'-এর পরবর্তী উপন্যাস 'রুশিকা' (২০১৬), ছোটগল্প সংকলন 'কয়েকটি গল্প'। বিমলের সব লেখার মধ্যেই আছে সময়ের আখ্যান। তাঁর লেখা পশ্চিমবঙ্গের

দার্জিলিং, পুরুলিয়া, চুঁচুড়া, বর্ধমান, কলকাতা, জঙ্গল যে অঞ্চলই হোক না কেন, তা যেন অনিকেত, দুর্গত মানুষের বসবাসের স্থান। কাল বা সময়

শব্দটাকে, বিমল যে খুব সংকীর্ণ বা সীমিত চোখে দেখেন না তা বিমলের উপন্যাস, ছোট গল্পগুলিকে পড়লেই বোঝা যায়। বিমলের 'রুশিকা' ও ছোট গল্পগুলির আড়ালেও উঁকি দিচ্ছে কোন এক বিশেষ সময় এই সময়ের হাত ধরেই উঠে আসে আখ্যান, চরিত্ররা। সময়ের হাত ধরেই বদলে যায় প্রান্তিক জনের আত্ম অনুসন্ধান। কখনও সমষ্টির কান্না আবার কখনও বিচ্ছিন্ন মানুষের আত্মসংকট। যে জীবন, যে সংকটের কথা পাথর চাপা হয়ে ছিল বিমল তা সরিয়ে শুশ্রূষার জলের সন্ধান করেন। বিমলের লেখায় বাংলা কথা সাহিত্যের সীমানা প্রসারিত হয়েছে, জমাট বাঁধা বরফ ওঁর লেখার গুণের উত্তাপে গলেছে।

বিমল অকপটে বলেছেন তাঁর জন্মকথা, প্রকৃতির সাথে আত্মীয়তার কথা। এসবের ছায়া নামে তাঁর লেখাতেও— 'ঘরের ওপরেই ছিল একটা আলপটকা পাথর। মাপে ঘরটারই তিনভাগ হবে। ঘর আর পাথরের মাঝখানে দিয়ে সরু গলিপথ। এই গলিতেই নাকি জন্ম আমার। ধাপচাষি মা আমার কোনও এক আষাঢ়ী বিকেলে চাষের ধাপেই কাহিল হয়ে পড়েন প্রসব বেদনায়। বনপ্রকৃতির মাঝে তিনি তখন পুরো একা। বেদনা সামলে তাড়াতাড়ি রওনা দেন ঘর মুখে। কোনও রকমে পৌঁছেও যান ঘরে। কিন্তু ঘরে ঢোকার আগেই ওই ঘর পাথরের গলিপথেই ভূমিষ্ঠ হয় তাঁর পুত্রসন্তান।' এই পুত্রসন্তানই পাথরের খাঁজে লিখতে শেখে অ আ ক খ। তারপর তো ইতিহাস। একদিন পাহাড়ের খাঁজের কুঁড়ে ঘর থেকে সূর্যকে দেখেছিলেন আজও তিনি তা দেখতে পান পুরুলিয়ার আবাসনের ছাদ থেকে। দার্জিলিঙে যে হিমেল কুয়াশা সরিয়ে তিনি দেখতে চেয়েছিলেন মানুষের মুখ, অনুভব করেছিলেন অনিকেত মানুষের যন্ত্রণা, তা পুরুলিয়ায়, জঙ্গল মহলে এসেও সমান অনুভব করেন। এই অনিকেত ভাবনা কখনও অলীক হতে পারে না। তাই 'নুন চা' থেকে 'রুশিকা'তে এসেও বিমল লেখেন— ঐ অলৌকিক হিমালচুলি 'যতই অলীক মনে হোক তার বাস্তবতা, চেতনার ভেতরে সে রয়ে গেছে।'পাহাড়ের পাথুরে গলিতে শেখা অ আ ক খ আজও কলরব মুখর তার লেখায়। পাহাড়ি গ্রাম সিংটামের এক পাথুরে গলির আকাশে যে সূর্য ওঠে, তা পুরুলিয়ার ঝালদার কোনও অজ গ্রামেও তা যে আলো ঠিকরায়, তার উত্তাপে পাঠক হিসেবে আমরা মুগ্ধ। বিমল আরও আরও লিখুন, আমরা অপেক্ষায় আছি।

সূত্র ঃ বিমল লামা। দেবতাও হার মেনেছে যেখানে।
তিতির, সম্পাদক সঞ্জয় সাহা। সপ্তদশ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা; চা-বাগানের সাহিত্য সংস্কৃতি।
মাথাভাঙা, কোচবিহার, ২০১৮।

রণজিৎ কুমার মিত্র

পাঠকের পত্র

জলপাইগুড়ি শিলালী নাট্যম ঃ কিছু তথ্য

এখন ডুয়ার্স প্রকাশনা গোষ্ঠী 'জলপাইগুড়ি' নামাঙ্কিত যে পুস্তকটি সাম্প্রতিক কালে প্রকাশিত করেছে, সেই পুস্তকে 'জলপাইগুড়ি জেলায় নাট্যচর্চার হালহকিকত' শীর্ষক নিবন্ধে জলপাইগুড়ি-র শিলালী নাট্যম্ সম্পর্কে গুটিকয়েক শব্দে কিছু কথা বলা হয়েছে। কিন্তু, আমরা মনে করি তা যথাযথ নয়। জেলা তথা এই উত্তরবাংলার নাট্য আন্দোলনে আমাদের সংস্থার ভূমিকা সঠিকভাবে পরিবেশিত হয় নাই।

জলপাইগুড়ি শিলালী নাট্যম্-এর প্রতিষ্ঠা ১২ নভেম্বর, ১৯৮২। ডা. সমীর বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত প্রথম প্রযোজনা 'রথ'। প্রথম মঞ্চ— ফালাকাটা রানার নাট্যগোষ্ঠী পরিচালিত একাংক নাটক প্রতিযোগিতা। স্থান— প্রথম। নাট্যদল হিসাবে আমরা সংকীর্ণ দলীয় রাজনীতির উর্দ্ধে এবং আমাদের বিশেষ বিষয় এই যে, আমাদের সংস্থা মৌলিক চিন্তাভাবনা নিয়ে চলার চেষ্টা করি আর সেই সাপেক্ষে 'মৌলিক নাটক' পরিবেশন করি।

১৯৮২-র প্রথম মঞ্চায়নের পর, সেই মৌলিকতার ভাবধারাকে সঙ্গে নিয়ে আমরা একের পর এক নাটক মঞ্চস্থ করেছি। আমি ভিক্টর বলছি, পরম্পরা, পর্যাবৃত্ত, গাব্বুখেলা, আক্রোশ, মৃত্যুহীন বেঞ্জামীন, নীলাকাশ, রথের রশি, স্বর্গলাভ, মানুষ মানুষের জন্য, শিল্পী, ডাইন, বিনিময়, সৈনিক, প্রহরীর গন্ডি, এখনও জীবন আছে, মুক্তি, জীর্ণবাহু, তান্ত্রিক, জলন্ত নক্ষত্র, বিলাপের সংলাপ, আরো আলো, ফ্যালনা, স্ম্যাক, অনুগামিনী, এবার বসন্ত, চিঠি, টি-বয়, নেপথ্য রাজ প্রমুখ নাটক। আনুমানিক ৮০-৮৫টি মৌলিক নাটক আমাদের আছে। আমাদের নবতম প্রযোজনা— 'প্রত্যাবর্তন'। বর্তমানে মহড়া চলছে 'কম্পাস' নাটকের। আমরা, দীর্ঘ প্রায় পঞ্চাশ বছর নাটকের সাথে যুক্ত অশোক ভট্টাচার্য্যের রচিত মৌলিক নাটক এবং তাঁর পরিচালনাতেই, এই সময় কালের নাট্য-আন্দোলনে যুক্ত আছি এবং সামগ্রিকভাবে মানুষের শুভেচ্ছা, অভিনন্দনে অনুপ্রাণিত হয়েছি।

আমরা, ১৯৮৩-র রাজ্য ছাত্র যুব উৎসবে দ্বিতীয় স্থান লাভ করেছি রাজ্যস্তরে। তেমনি রবীন্দ্র-১২৫তম নাট্য প্রতিযোগিতা, ১৯৮৫, ১৯৯৫, ১৯৯৮, ১৯৯৯-এর ছাত্র যুব উৎসবে জেলায় প্রথম স্থান অধিকার করে রাজ্য স্তরে অংশগ্রহণ করেছি। আবার, ২০১৩-র ছাত্র যুব উৎসবেও জেলাস্তরে প্রথম স্থান লাভ করেছি। ১৯৯৪-এ কলকাতা থিয়েটার সেন্টার আয়োজিত (সারা বাংলার ২৫০টি নাট্যদলকে নিয়ে) প্রতিযোগিতায় পুরস্কৃত হয়েছি। বাংলার বাইরে ১৯৮৯-এ কানপুর শহরে এবং ১৯৯১-এ নাগপুর শহরে সারা ভারত নাট্য প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছি। উল্লেখ— মৃত্যুহীন বেঞ্জামিন নাটকে অভিনয়ের সুবাদে ভারতী ভট্টাচার্য 'দিশারী' পুরস্কারে ভূষিত হয়েছিলেন।

আমরা নিজস্ব উদ্যোগে 'নাট্যমেলা ১৯৯০' জলপাইগুড়ি রবীন্দ্র ভবনে আয়োজন করেছি। নাট্যমেলার উদ্যোগ সারা বাংলার নাট্যকর্মীদের কাছে বিশেষভাবে প্রশংসিত হয়েছিল।

১৯৯৫-এ এবং ২০০০ সালে উত্তরবাংলার নাট্যদল নিয়ে নাট্য উৎসব এবং প্রতিযোগিতা যেমন করেছি তেমনি বদ্ধ ঘরে আবদ্ধ না থেকে, আমাদের নিজস্ব পরিকল্পনায় নির্মিত 'FOLDING STAGE'-এর সাহায্যে শহরের বিভিন্ন প্রান্তে 'মুক্তমঞ্চে' শহরের নাট্যদলগুলিকে সাথে নিয়ে নাটক ছড়িয়ে দেবার চেষ্টা করেছি। শুধু তাই নয়, পরিবেশ দূষণ বিরোধী নাটক 'নীলাকাশ' FOLDING STAGE-র মাধ্যমে পরিবেশিত হয়েছে শতাধিক স্কুল ও কলেজে ১৯৮৮ থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত।

১৯৮২ থেকে ২০১৯ এই দীর্ঘ সময়ে এই শহরের অনেক বিশিষ্ট শিল্পীবৃন্দ আমাদের সংস্থায় নাটকের কাজে যুক্ত থেকেছেন এবং সমৃদ্ধ করেছেন। দীর্ঘ সময় চলার পথে প্রাকৃতিক নিয়মেই কখনও অতি সক্রিয় থেকেছি, কখনও কিছুটা শ্লথগতিতে চলেছি। কিন্তু, এই শহরের সাংস্কৃতিক চর্চায় সব সময় ব্যস্ত থাকার চেষ্টা করেছি।

সুব্রত সেন
শিলালী নাট্যম,জলপাইগুড়ি

শুভ্র চট্টোপাধ্যায়ের নতুন ধারাবাহিক কাহিনি

অনেক দিন আগেকার কথা। কৌরব-পান্ডবরা তখন ছোট। দিস্তং নদীর পাড়ের দেশ থেকে ভুসকু গেল হস্তিনাপুর বেড়াতে। তাঁর ইচ্ছে ভীমের সঙ্গে দেখা করবে। কিন্তু হস্তিনাপুরে সে জড়িয়ে পড়ল এক সঙ্কটে। কী সেই সঙ্কট? কেনই বা ভুসকু জড়িয়ে গেল তাতে? এ সব জানার জন্য পড়তে হবে নতুন ধারাবাহিক।

তাজ্জব মহাভারত

সব বয়সের উপযোগী এই উপন্যাস ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হচ্ছে আগামি সংখ্যা থেকে।

ঘাসফুল দর্শকের সরিষাফুল দর্শন

একটি উত্তরাধুনিক ভোটফল বিচার

ফল বাহির হইতেই দেখি সব গেরুয়া হইয়া গেল। কঙ্কেগ্রাম কলিকা সমিতির সভপতির বেদিটা নীলসাদা ছিল। সন্ধ্যা লাগিবার প্রাক্কালে কে জানি গেরুয়া পোঁচ মারিয়া দিল। সমিতির কলিকাগুলি ছিল কৃষ্ণবর্ণ। সমিতির সদস্য, ভূতপূর্ব অ্যাবস্ট্রাক্ট আর্টিস্ট কয়েক খানি গেরুয়া আঁচড় মারিয়া কহিল, ইহা পদ্মফুল। বসুনিয়া দারোগা বলিল, ফুল কোথা হে? এ তো মনে হচ্ছে হাতল বিহীন কাস্তেহাতুড়ি! আর্টিস্ট কহিল, আর্ট কখনও সোজা কথা সোজা ভাবে বলে না।

সমিতির বরিষ্ঠ সদস্য ভূপতিবাবু কোথা হইতে উচ্চাঙ্গের মহাতামাক আনিয়াছিলেন। তাহার ধক্ বুঝিবার নিমিত্তে সেই তামাক সাত ছিলিম টানিয়া একখানি সমীক্ষা রচনা করিয়াছিলেন। তাহা ছিল এইরূপ—

মোট আসন—	৪২
দিদিভাই—	১৭
বামফন্ট—	২৪
কং—	০০
বিজেপি—	০০
এসিউসিয়াই—	০১

ফল বাহির হইতে বুঝা গেল সেই তামাকের জবাব নাই। ইহা পজিটিভ সংবাদ। হেনকালে পুরন্দর ভাট তাঁহার নতুন কবিতা হোয়াটস্যাপে পাঠাইতেই মূল ব্যাপার বুঝিলাম। তিনি দুই লাইনে বলিয়াছেন—

কুমীর আনিবে বলে কাটিছিলে খাল।
কুমীর আসিল যেই কহ তারে বাল।।

যাহা হউক সম্পাদকের নির্দেশ মানিয়া নির্বাচন পর্যলোচনায় বাহির হইলাম।

কোচরাজ্যে ভূকম্প

কোচরাজ সূর্যবাবুকে নাকি খুশি খুশি দেখাইতেছে! ইহা জানিয়া প্রথমেই সেই দেশ যাইয়া দেখি কথাটা মিথ্যা নহে। পাব্লিক কহিল যে তাঁহার অমাত্য হারিয়া গিয়াছে ইহা তিনি বুঝেন নাই। তাই খোশমেজাজেই ঘুরিতেছেন। প্রজারা যে ভাবে রথ দেখিয়া কলা ফেলিয়া ছুটিয়াছে তাহা নাকি তিনি ভাবিতেছেনই না। শুনিয়াছি, কোথাও ভূকম্পন হইলে সবই কম্পিত হয়। তাহলে? তখন কে জানি একজন মোমো খাইতে খাইতে কহিল, সবাই হেরে গেছে মানে হেরোদের মধ্যেও কেউ ফাস্ট হয়। সূর্যরাজ ফার্স্ট। মার্জিন গুনিলেই বুঝিবেন! একজন ভূগোলের শিক্ষক কাগজে নক্সা আঁকিয়া বুঝাইলেন যে সূর্য কখনই বুঝে না যে সে ডোবে। পরে যখন রচনাটি লিখিতেছি, জানিলাম ছোটসূর্য অস্তাচলে। রথদপ্তর তাঁহার হাতছাড়া। কোচরাজ্য কম্পমান। তবে পরাজয় নহে হার। তাই কম্পন নহে কাঁপন।

আলিনগরে গালাগালি

সুগন্ধবাবু সেদিন মাধ্যমলোকদের ডাকিয়া কহিলেন নির্বাচন হইল বিজ্ঞান এবং তিনি তাহা শিখাইয়া থাকেন। শুনিয়া শিহরিত হইয়াছিলাম। সমিতির দিদিভক্ত নিধিরামবাবু সেই সংবাদ মোবাইলে সকলকে দেখাইয়া বলিয়াছিলেন, দেখেছ? কিন্তু ফলান্তে শুনিলাম তাঁহার বিজ্ঞান ফেল মারিয়াছে। সূর্যরাজ কি হারিয়াছেন! সুগন্ধরাজের হারত্ব তাহার তিনগুণ! কিন্তু সায়েন্স ফেল মারিল কেন? শুনিয়া জনৈক আদিদিভক্ত নাক কুঁচকাইয়া কহিলেন, আর্টসের স্টুডেন্ট তো, তাই সায়েন্স বোঝে নি! আমরা গোড়া থেকে দলে— আমরা কি বুঝি না? এইবার দেখুন কী হয়? তা আদি দিদি মানে আদিদিপন্থী মন্দ বলেন নাই। দু-দিন পর ময়নাগড় থেকে সংবাদ পাইলাম সুগন্ধীর রথে কাহারা জানি স্নেহবশত পাটকেল মারিয়াছে। আলিনগরের প্রজারাও খুব গালি দিতেছে এখন। সুগন্ধীরাজের চাপ কমাইবার জন্য পুরন্দর একখানি পদ লিখিয়া দিয়াছে। ভাবার্থ বুঝিলে চক্ষে জল আসে।

'গাড়ি হতে বাহির হয়ে বাইরে দাঁড়া
বুকের মাঝে কমললোকের পাবি সাড়া।'

বৈকুণ্ঠপুর হুড়মুড়

এই রাজ্যের আবার রাজা নাই। আলি-উল-মুলুকের শাসনে চলে। উত্তরের রাজাধ্যক্ষ শ্রীঅরূপরতন কখনও কখনও টহল মারিয়া যান। ফল হইয়াছে এই যে রাজ্যখানি যায় যায়। চন্দ্রজয়বাবুকে বড় বড় সমীক্ষকগণ কহিয়াছিল যুদ্ধে জিতিবেন। কিন্তু ইভিয়েম ঘাঁটিয়া জানা গেল যত ভোটে জিতিয়াছিলেন তাহার দ্বিগুণে হারিয়াছেন। কিন্তু এইরূপ হইল কেন? তিনি তো অভিধান রচনা হইতে শুরু করিয়া মহাপারিষদের বিবাহানুষ্ঠান— সব কিছুতেই বিপুল উদ্যমে হাজির থাকিতেন! তিনি লোকসভার মেম্বার রূপে কয়েকটি লোককেই দেখিতেন। তাহাদের বাকি লোকেরা দেখিত। ইহাতে তাঁহার বক্ষ চওড়া হইত— তথাপি ফেল মারিলেন কেন? তাহলে এত খর্চা করিয়া কী লাভ হইল? সাংসদদের উপদেশ বিতরণকালে পুরন্দর একদা কহিয়াছিলেন,

'আপনার লোক রাখিলে সভায়
হয় না কো লোকসভা
পাগল বুঝিল, মাতাল বুঝিল
তবু বুঝিল না গবা!'

বুঝিল না বলিয়াই না হুড়মুড়াইয়া ভাঙিল।

সমিতির বিশ্লেষণ

সমিতির সদস্য তথা নির্দল পার্টির প্রার্থী নেতৃত্বে যে কমিশন বসান হইয়াছিল তাঁহারা টানা এগার ঘন্টা সমিতির কার্যালয় ধূম্রাচ্ছন্ন করিয়া রিপোর্ট জমা দিয়াছে। রিপোর্ট অবশ্য তিন লাইনে সমাপ্ত। তাহা হইল—

"ডুয়ার্সের জঙ্গলে যাওয়া ভাল।
জঙ্গলে হস্তি দর্শন ভাল।
কিন্তু হস্তির পঞ্চম পদ দর্শনের ফল ভাল নহে।"

রিপোর্টের ভাব সম্প্রসারণ করিলাম না। সমিতির সদস্যদের আমি বিলক্ষণ চিনি। উহাদের ধারণা, এইবার দেশে মহাতামাক আইনসিদ্ধ হইবে। সমিতির স্বার্থেই তাঁহারা এমন রিপোর্ট বানাইয়াছে।

সমিতির সিদ্ধান্ত

১) ডিএ লইয়া নাচিবার কিছু নাই। যাহারা ডিএ পায় তাঁহাদের ভোট কাহারো দরকার নাই।
২) কোনও অবস্থাতেই দিদি বিজেপিতে যোগ দিবেন না। ভাইগণ যে কোনও অবস্থাতেই যোগদান করিতে পারে।
৩) ডুয়ার্সে বুথ মিটিঙে মুখ্যমন্ত্রীকে হাজির দেখিলে ঘাবড়াইবেন না।

বাকি কথা

ডুয়ার্সের বাকি খবর যা বলিবার তাহা হইল, হাতি-বাঘেরা সন্ত্রাস অব্যহত গতিতে চালাইয়াছিল। বড় পরীক্ষায় বালিকা-বালকেরা ভাল ফল করিয়াছিল। কেন্দ্রিয় বাহিনী প্রচুর সিঙারা কিনিয়া খাইয়াছে। কোনও কোনও ভোট কর্মি খরচ করিয়া বিপদতারিনী কবচ পরিয়া ইভিয়েম বগলে বুথে গিয়াছিলেন। কোচরাজ্যে দাঙ্গাহাঙ্গামা-গোলাগুলি চলিতেছে এবং ইহার জন্য কেহ দায়ি নহে।

কলম সিং

যো জিতা ওহি সিকান্দর

নির্বাচন রাজনীতির পাচন

জয়ন্ত গুহ

২০১৯-এ ভারতের সাধারণ নির্বাচনে নরেন্দ্র মোদীর জয় এক্কেবারে যেন পেলে-জোয়ারজিনহোর ব্রাজিল টিমের বিশ্বকাপ জয়ের মত। সবাই জানে ব্রাজিল জিতবে। আটকানো যাবে না পেলে-জোয়ারজিনহো-কে। তবু সবার উৎকণ্ঠা নিয়ে অপেক্ষা, কতক্ষণ এবং কীভাবে জোয়ারজিনহো প্রতিদ্বন্দ্বীকে খেলতে দেবেন। বুঝে নেবেন প্রতিপক্ষের শক্তি ও দুর্বলতা। তারপর মাঝমাঠ থেকে কখনও আচমকা প্রতি আক্রমণ কিংবা মুহুর্মুহু আক্রমনে ভেঙে দেবেন প্রতিপক্ষের ডিফেন্স।

একটু খেয়াল করে দেখুন, রাফেল নিয়ে বিজেপিকে বিঁধতে রাহুল, মল্লিকার্জুন খাড়গে, গুলাম নবি আজাদরা তখন লোকসভা ও রাজ্যসভায় প্রবল আক্রমণ শানাচ্ছেন বিজেপির বিরুদ্ধে এবং মাঠের বাইরে থেকে সোল্লাসে সমর্থন জানাচ্ছেন দুর্নীতির পরাকাষ্ঠা অখিলেশ-মায়া, সুযোগসন্ধানী ফারুখ আবদুল্লা ও মমতা, জেলবন্দী লালুর খিলাড়ি পুত্র তেজস্বী এবং এক্সপায়ারি ডেট পেরিয়ে যাওয়া একদা বিজেপির গদিলোভী পক্ককেশ কিছু নেতা। মাঠের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা এইসব "ক্ষীরপ্রত্যাশী" এক্সট্রা প্লেয়ারদের উত্তেজনার পারদ পাল্লা দিয়ে বাড়তে থাকে, বিজেপির সঙ্গে শিবসেনার দূরত্ব যত বাড়তে থাকে রামমন্দির ইস্যুতে। আসলে দূরত্ব নয়, বিভক্ত হয়ে প্রতিপক্ষকে বোকা বানানোর কৌশল ছিল সেটা। আর পাশাপাশি রাফেলের মত একটি মাকাল ফল নিয়ে প্রতিপক্ষকে দীর্ঘসময় ধরে খেলা চালিয়ে যেতে দিয়েছেন অমিত-মোদী জুটি।

গোটা মাঠ জুড়ে একটা লোক দৌড়ে দৌড়ে সবাইকে জলপট্টি দিচ্ছে আর বলছে "এ খেলায় আমাদের জিততেই হবে"। যদিও লোকটা কখনও লুডো খেলেছে কিনা সন্দেহ— চন্দ্রবাবু নাইডু। আসলে কেউই খেলছেন না কিন্তু 'খেলছি খেলছি' ভাব দেখাচ্ছেন। ফাঁকেতালে কেউ যদি গোল করে ফেলে! কোনওমতে! তাহলে গোল দেবার পর আলোচনায় বসে ঠিক হবে, সেই গোলে কার কতটা ভূমিকা ছিল এবং কে কতটা দাবীদার। আসলে কারুরই কোনও লক্ষ্য ছিল না।

গোল না পেয়ে মরীয়া বিরোধীদলের সবাই মিলে মাঠে নেমেছেন এবং ফাঁদে পা দিয়েছেন যৎপরোনাস্তি। ততক্ষণে কিঞ্চিৎ চোট নিয়ে মাঠের বাইরে বসে থাকা শিবসেনা ফিরে এসেছে মাঠে। উল্টোদিকে প্রতিপক্ষ শিবিরে তখন বিচিত্রকাণ্ডের সমাহার। একদিকে নিজেই নিজের মাফলারে পা জড়িয়ে পড়ে গিয়ে ভ্যা ভ্যা করে কাঁদতে কাঁদতে রাহুলকে ডাকছে কেজরিওয়াল। অন্যদিকে পায়ে বল পেলেই অখিলেশ-মায়াবতী এক্কা দোক্কা খেলছে। মাঠের পূর্বপ্রান্তে এক বদমেজাজি প্লেয়ার। বল পেলে বল-ই প্রায় কামড়ে দেন— মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এবং গোটা মাঠ জুড়ে একটা লোক দৌড়ে দৌড়ে সবাইকে জলপট্টি দিচ্ছে আর বলছে "এ খেলায় আমাদের জিততেই হবে"। যদিও লোকটা কখনও লুডো খেলেছে কিনা সন্দেহ— চন্দ্রবাবু নাইডু।

আসলে কেউই খেলছেন না কিন্তু 'খেলছি খেলছি' ভাব দেখাচ্ছেন। ফাঁকতালে কেউ যদি গোল করে ফেলে! কোনওমতে! তাহলে গোল দেবার পর আলোচনায় বসে ঠিক হবে, সেই গোলে কার কতটা ভূমিকা ছিল এবং কে কতটা দাবিদার। আসলে কারুরই কোনও লক্ষ্য ছিল না। দিশাহারা সবাই মূলত গোলের নিশানা খুঁজেছে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ভোটে। অথবা জাতপাতের বিভাজন ভোটে। দ্য টাইম এবং দ্য ইকনমিস্ট ম্যাগাজিন যখন মোদীকে নিয়ে কভার স্টোরি করছে, তখনও বিরোধীদের সম্বিত ফেরেনি। যদিও দুটোই ছিল 'নেগেটিভ' স্টোরি কিন্তু নির্বাচনের আঙিনায় মোদী তখন এতটাই অবশ্যম্ভাবী বা পপুলার ব্র্যান্ড হয়ে উঠেছেন যে তাঁকে নিয়ে কভার স্টোরি করতে হচ্ছে এবং পাশাপাশি সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছচ্ছে না, লেখার ভাষা ইংরাজি বলে। উচিৎ ছিল ধরে খেলা। কিন্তু কে কার কথা শোনে! এক আঞ্চলিক নেত্রী তখনও ৪২শে

৪২ বলে দাপাদাপি করছেন, মোদীকে থাপ্পর মারবেন বলছেন। ম্যানেজ দিতে পরক্ষণেই অবশ্য গণতন্ত্রের থাপ্পর বলছেন এবং অদ্ভুত হলেও সত্যি, কংগ্রেস নেতারা দাবি করেছিলেন '১৫০ এবার পাবোই'। কার্যত জেতা তো দূরের কথা, জেতার ইচ্ছেটাই বোধহয় তাঁদের ছিল না।

শেষমেশ কংগ্রেস অবশ্য একটা চেষ্টা করেছিল। অর্থনীতি, কৃষি সঙ্কট, বেকার সমস্যা, 'ন্যায়' প্রকল্পের ঘোষণা দিয়ে শেষ মুহূর্তে বাজিমাতের চেষ্টা কিন্তু ততক্ষণে যা হবার হয়ে গেছে। নতুন প্রজন্মের ভোটার, গ্রামের ও শহরের ভোটার, মহিলা ভোটার, দলিত ভোটার, গরীব ও মধ্যবিত্ত ভোটার সব্বাই মূলত দু'দলে ভাগ হয়ে গেছে। মোদী এবং মোদী বিরোধী ভোটে। ফুটবল মাঠে জাত প্লেয়াররা বারবার যেমন খেলার ধরন পাল্টায়, ঠিক তেমনই স্বভাব অনুযায়ী বারবার স্লোগান বদলেছেন মোদী-অমিত জুটি। আর শেষের স্লোগানটি ছিল ব্রহ্মাস্ত্র। "মোদী নাহি তো হ্যায় কওন?" উত্তরটা আমরা পেয়ে গিয়েছিলাম একজিট পোল প্রকাশ হওয়া মাত্রই। প্রতিপক্ষ ছিল না মোদীর। মোদীকে বিরোধিতা দেবার মত ম্যাচিওরিটি ছিল না ইউপিএ-র দলনেতা রাহুল গান্ধির। সুতরাং না জিতে মোদীর উপায় ছিল না। স্মরণীয় ভাবে জিতলেন এবং আসমুদ্র হিমাচলে প্রমাণ করলেন, তাঁকে নিয়ে যাবতীয় কুৎসা, সমালোচনা, ভুলভ্রান্তি, দোষগুণের ঊর্দ্ধে তিনি— কেন না 'যো জিতা ওহি সিকান্দর'। মানুষের ঐতিহাসিক রায়ে তিনি 'হিন্দুস্তান কি সিকান্দর'।

এনডিএ ৩৫৩ বিজেপি ৩০৩

কী করে হল এমন ফলাফল? ম্যাজিক? ভোজবাজি? ইভিএম কারচুপি? বিদেশ থেকে স্যাটেলাইট মারফৎ সিগন্যাল পাঠানো হয়েছিল মঙ্গলে গোপনে বসানো আম্বানির হাইটেক সেটআপে এবং সেখান থেকেই ভোটারদের ব্রেন হ্যাকিং হয়েছে? নাকি বিরোধীদের মধ্যে বিশ্বাসযোগ্য কোনও মুখ ছিল না?

রাজনৈতিক বিশ্লেষক এবং মোদীর কট্টর সমালোচক যোগেন্দ্র যাদবের মতে, "এই ভোটের তিনটি বড় বিষয়। এক, নরেন্দ্র মোদী জাতীয়তাবাদের মত বড় বিষয়ে মানুষকে মুগ্ধ করতে পেরেছেন। বিরোধী শিবিরের কেউ এমন কোনও বড় বিষয় তুলতে পারেননি। এতে বেকারত্ব, কৃষি সঙ্কটের মতো মৌলিক বিষয়গুলি হারিয়ে গিয়েছে। সেটাই মোদীর সাফল্য। আর নিছক জোট কোনও কাজ করে না। কর্নাটকই তার উদাহরণ। আর শুধু নেতা কিছু করতে পারে না, যদি না তার পিছনে সংগঠন থাকে। নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে সে কাজটি করেছেন অমিত শাহ।" তার মানে প্রকারান্তরে যোগেন্দ্র যাদব স্বীকার করতে বাধ্য হলেন যে বিজেপির জোরালো সাংগঠনিক শক্তি আছে এবং সুকৌশলে বালাকোট আক্রমণকেই একমাত্র কারণ দেখিয়ে আসলে ঢাকতে চাইলেন— কেন দরিদ্র, মধ্যবিত্ত, দলিত এবং উচ্চবর্ণের ভোটাররা কেউই বিশ্বাস করল না যে বিজেপি সাম্প্রদায়িক, সাংঘাতিক এবং দেশের পক্ষে ক্ষতিকর। যে কথা কাকাতুয়ার মত বারবার বলে গেছেন যোগেন্দ্র যাদবসহ বিরোধীরা।

লেফট লিবারাল বুদ্ধিজীবিদের কাছে সত্যি কোনও উত্তর নেই, কেন মুখ থুবড়ে পড়ল রাফ্যল এবং 'চৌকিদার চোর হ্যায়' ইস্যু? কেন মানুষ বিশ্বাস করল না দেশের অর্থনীতির অবস্থা খুব খারাপ? কেন নোটবন্দী এবং জিএসটি নিয়ে এত চিৎকার চেঁচামেচি করেও বিরোধীদের পক্ষে ভোটের স্রোত বইল না?

উটের মত মাটিতে মুখ গুঁজে রাখলে বা চোখ বন্ধ করে রাখলে উত্তর মিলবে না কিন্তু উত্তর পাওয়া খুব কঠিন নয়। কেন না নরেন্দ্র মোদীর এই ঐতিহাসিক জয় কোনও আধিভৌতিক কারণে ঘটেনি। কঠোর পরিশ্রম এবং সাধারণ বুদ্ধিতেই এই অসামান্য ফলাফল এবং বিশ্বাস করুন এর জন্য কেমব্রিজ বা অক্সফোর্ড ফেরত বুদ্ধির প্রয়োজন পড়েনি। এর জন্য দরকার শুধু দেশ, দেশের মানুষ, দেশের মাটি এবং সময় অনুযায়ী

২০১৪-২০১৯ নরেন্দ্র মোদীর সরকার মনোযোগ দিয়েছেন এই জমি তৈরিতে, মানে ইকনমিক রিফর্ম এবং মাইক্রো অর্থনীতিতে। তারই অন্তর্গত জিএসটি, নোটবন্দী, স্বাস্থ্যবীমা, স্বচ্ছ ভারত, জনধন-উজ্জ্বল-উজালা যোজনা, আধার সহ অসংখ্য যোজনা ছিল যা দিয়ে আসলে ধর্ম-মত নির্বিশেষে যত দ্রুত সম্ভব গরীব মানুষের সংখ্যা কমিয়ে তাঁদের অর্থনৈতিক ভাবে মধ্যবিত্ত স্তরে নিয়ে আসা যায়। যারা যোগদান করবে দেশের পরবর্তী স্তরের অর্থনৈতিক উন্নয়নে। পাশাপাশি সরকারি আয়ের বিপুল অংশ ব্যবহার করা হয়েছেইনফ্রাস্ট্রাকচার নির্মাণে, যার সবকিছু এখনও শেষ হয়নি কিন্তু কাজে লাগবে মোদীর দ্বিতীয় দফায় ম্যাক্রো অর্থনীতি উন্নয়নে।

প্রয়োজনের যোগান।

শুনতে কঠিন লাগলেও ম্যাক্রো এবং মাইক্রো ইকনমিক্স খুব একটা হাতিঘোড়া কিছু নয়। আমাদের দেশে গাঁয়ে চাষাদের সঙ্গে কিছুদিন কাটালেই জলের মত পরিষ্কার হয়ে যাবে। চমক লাগানোর জন্য আপনি বিরাট বিরাট ফলভর্তি গাছ আপনার জমিতে এনে লাগিয়ে দিতে পারেন। ফল পাবেন ঠিকই কিন্তু গাছটা বেশিদিন বাঁচবে না। এই ধরনের চমক লাগান বা ইন্সটলেশনে অর্থনীতি টেঁকসই বা সাসটেইনেবল হয় না। তার জন্য আগে দীর্ঘসময় ধরে মাটিকে তৈরি করতে হয়, অর্থনীতিতে যা কিনা মাইক্রো অর্থনীতি এবং তা থেকে পরবর্তীকালে দীর্ঘসময় ধরে আপনি যে বিপুল ফলাফল পাবেন, যা থেকে বড় শিল্প ও কর্মসংস্থান হবে তা হল অর্থনীতিতে ম্যাক্রো অর্থনীতি।

২০১৪-২০১৯ নরেন্দ্র মোদীর সরকার মনোযোগ দিয়েছেন এই জমি তৈরিতে, মানে ইকনমিক রিফর্ম এবং মাইক্রো অর্থনীতিতে। তারই অন্তর্গত জিএসটি, নোটবন্দী, স্বাস্থ্যবীমা, স্বচ্ছ ভারত, জনধন-উজ্জ্বল-উজালা যোজনা, আধার সহ অসংখ্য যোজনা ছিল যা দিয়ে আসলে ধর্ম-মত নির্বিশেষে যত দ্রুত সম্ভব গরীব মানুষের সংখ্যা কমিয়ে তাঁদের অর্থনৈতিক ভাবে মধ্যবিত্ত স্তরে নিয়ে আসা যায়। যারা যোগদান করবে দেশের পরবর্তী স্তরের অর্থনৈতিক উন্নয়নে। পাশাপাশি সরকারি আয়ের বিপুল অংশ ব্যবহার করা হয়েছে ইনফ্রাস্ট্রাকচার নির্মাণে, যার সবকিছু এখনও শেষ হয়নি কিন্তু কাজে লাগবে মোদীর দ্বিতীয় দফায় ম্যাক্রো অর্থনীতি উন্নয়নে। গরীব এবং মধ্যবিত্তের ফারাক ঘোচাতে বদ্ধপরিকর মোদী, ২০২৪-র নির্বাচনের কথা মাথায় রেখে সোজাসাপটা টার্গেট নিয়েছেন। ২০১৯ ঐতিহাসিক জয়ের পর তাঁর স্পষ্ট উচ্চারণ, "একবিংশ শতাব্দীতে শুধু দু'টিই জাতি থাকবে। একটি জাতি, যাঁরা দারিদ্র্য থেকে মুক্তি চাইছেন। দ্বিতীয় জাতি, যাঁরা সেই দারিদ্র্য মুক্তি দিতে সাহায্য করছেন।" আর এই যুদ্ধে বিশাল ভূমিকা নেবে ধর্ম ও জাতপাত নির্বিশেষে মধ্যবিত্ত শ্রেণি যারা স্বাধীনতার পর থেকে ২০১৪ পর্যন্ত পড়ে ছিল এককোণে, অবহেলিত। ২০১৪ সালে, উচ্চবর্ণের পাশাপাশি এই মধ্যবিত্ত শ্রেণিই মোদীকে এনে দিয়েছিল আকাঙ্ক্ষিত বিজয়।

নতুন শ্রেণির ভোটার ২০১৯ ঃ মধ্যবিত্ত শ্রেণির উত্থান

২০১৮ সাল। দেশের ৭২তম স্বাধীনতা দিবসে লালকেল্লায় ভাষণ দিচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এবং এই প্রথম দেশের কোনও প্রধানমন্ত্রী সরাসরি উল্লেখ করলেন নিম্ন মধ্যবিত্ত, মধ্যবিত্ত এবং উচ্চ মধ্যবিত্তের কথা। "আমাদের স্বাধীনতা আমাদের অনুপ্রেরণা দিয়েছে আমরা যাতে গরীব মানুষের কল্যাণে ব্রতী হই কিন্তু নিম্ন মধ্যবিত্ত, মধ্যবিত্ত এবং উচ্চ মধ্যবিত্তের কথাও মাথায় রাখতে হবে আমাদের। এমন একটা পরিবেশ তৈরি করতে হবে যাতে তাঁরাও মাথা উঁচু করে অক্লেশে এগিয়ে যেতে পারে"। এটা ছিল নরেন্দ্র মোদীর মাস্টারস্ট্রোক। এখানেই শেষ নয়। ফেব্রুয়ারিতে বাজেট এবং নির্বাচনী ইস্তাহারেও মধ্যবিত্ত শ্রেণিকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। কেন না প্রথমত এই মধ্যবিত্ত, গরীব এবং পিছড়ে বর্গের মানুষ ২০১৪ সালে কংগ্রেস থেকে সরে এসেছিল। অন্যান্য অনেক কারণ থাকলেও প্রধান কারণ ছিল, গোটা পৃথিবীর সঙ্গে তাল মিলিয়ে ভারতেও প্রত্যাখান করা শুরু হয়েছিল এলিটিজম-কে এবং মানুষ আঁকড়ে ধরেছিল তাঁদের মতই এক গরীব মধ্যবিত্ত মানুষের জীবনের বাঁচার লড়াই। ২০১৫ সালে ফেসবুক কর্ণধার জুকেরবার্গের সঙ্গে এক লাইভ অনুষ্ঠান চলাকালীন, মায়ের কথা বলতে গিয়ে যখন কান্নায় বাকরুদ্ধ হয়ে দেশের প্রধানমন্ত্রী সমস্ত এলিটিজমকে চুরমার করে দিয়ে বলেন, "সংসার চালানোর জন্য আমার মা প্রতিবেশীদের বাড়িতে কাজ করত... এবং এমন মা ভারতবর্ষে আছে কোটি কোটি... তাঁদের পাশে দাঁড়াতে চায় আমার সরকার"। সেদিন থেকেই তিনি

দেশের গরীব, মধ্যবিত্ত, এবং পিছড়ে বর্গের মানুষের কাছে 'হিন্দুস্তান কি সিকান্দর'।

২০০৯ অবধি দেশের রাজনীতির ওপিনিওন নির্ভর করত গরীব মানুষদের ভোটে। দেশের মোট জনসংখ্যার ৪১ শতাংশ ছিল গরীব। আজ মধ্যবিত্ত ৪০ শতাংশ এবং গরীব ১৬ শতাংশ, ২০১৪ সালে যা ছিল ৩৬ এবং ২০ শতাংশ। উচ্চ ও নিম্নবর্ণ যথাক্রমে ১১ ও ৩৩ শতাংশ।

মূলত শহরের উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণির পার্টি বিজেপি। কিন্তু মোদী-শাহ জুটি এবং তৃণমূল স্তরে আরএসএস-র সংঘটিত সমর্থনে, এবারের নির্বাচনে বিপুল পরিমাণ গ্রামের ভোট, মহিলাদের ভোট পেয়েছে বিজেপি। যার সিংহভাগ এসেছে মধ্যবিত্ত শ্রেণির কাছ থেকে। যাদের নিয়ে 'পলিটিক্যাল পণ্ডিত'-দের নিদান ছিল 'নন ভোটিং ক্লাস'।

এই গ্রেট ইন্ডিয়ান মিডল ক্লাস-ই আগামীদিনে ভারতবর্ষে রাজনীতির চালিকাশক্তি। স্বাধীনতার আগেও এই শ্রেণিই ছিল দেশের পাওয়ার হাউস। দেশ স্বাধীন হবার পর তাঁদের অবস্থান ক্রমাগত নিম্নগামী হয়েছিল। মোদী তাঁদের সম্মান ফিরিয়ে দিয়েছেন। প্রতিজ্ঞা করেছেন একমুঠো স্বস্তির।

এবার লক্ষ্য 'সবার বিশ্বাস'

তিনি যে ভিন্ন পথে চলেন, তাঁর দেখার ভঙ্গিমা যে আলাদা, তাঁর নেতৃত্বে বিজেপি দল যে, আদি-অকৃত্রিম ঝুরি নেমে আসা প্রাচীন এবং প্রায় আধিভৌতিক এক তান্ত্রিকের সঙ্গে তুলনীয় কংগ্রেস দলের চেয়ে আলাদা, তা তিনি বারবার প্রমাণ করেছেন। তিনি খুব ভাল বোঝেন, আজকের সময়ে দাঁড়িয়ে আজকের প্রজন্ম, কম্যুনিস্টদের মত দলভিত্তিক বা সোশ্যালিস্টদের মত পরিবারভিত্তিক শাসন চায় না। আজকের প্রজন্ম দেশের প্রধানমন্ত্রীকে আইকনিক মডেল হিসাবে দেখতে চায়। দেশনেতাকে আজকের ভারতবর্ষ, মেইনস্ট্রিম সিনেমায় বড়লোক বাবার একমাত্র ছেলের হঠাৎ গজিয়ে ওঠা গুলগপ্পের নায়কের মত দেখতে চায় না। ২০১৯-এর ভারত এমন এক দেশনেতাকে দেখতে চায়, যিনি সামান্য এক পরিবার থেকে ধীরে ধীরে কঠিন পরিশ্রম এবং একের পর এক সাফল্যের চৌকাঠ পেরিয়ে আজ দেশের প্রধানমন্ত্রী। সমগ্র দেশে তিনি বর্ণ-বর্গ নির্বিশেষে এক চূড়ান্ত উদাহরণ। রামকৃষ্ণ মঠের ত্যাগ-তিতিক্ষা-সেবা, বাংলার মাটিতে উদ্ভুত দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবাদের আদর্শ এবং কর্পোরেট আউটলুকের মিশেলে এক অনন্য ব্র্যান্ড —নরেন্দ্র মোদী।

প্রধানমন্ত্রীত্বের প্রথম দফায় দেশের প্রতি তাঁর মেসেজ ছিল "সবার সঙ্গে। সবার বিকাশ"। এবং অস্বীকার করবার উপায় নেই সেটা তিনি করে দেখিয়েছেন। গ্রামের গরীব মানুষের বাড়িতে শৌচালয়, এলপিজি গ্যাস লাইন, বিদ্যুৎ বা স্বাস্থ্য বীমা পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে কোথাও ধর্মের বিভাজন হয়নি। 'উস্তাদ' প্রকল্পে উপকৃত হয়েছে অসংখ্য মুসলমান কারিগর কিন্তু তবুও বিজেপি এবং তাঁর দার্শনিক ভিত্তির সহযোগী সংগঠন আরএসএস নিয়ে কম্যুনিস্ট ও সোশ্যালিস্টদের দীর্ঘদিনের প্রোপ্যাগান্ডা এবং ২০১৯ নির্বাচনেও তাঁরা সেই মান্ধাতার আমলের বস্তাপচা বুলি আউড়েছে, 'মুসলমানদের জন্য ভয়ংকর আরএসএস-বিজেপি। বিজেপি উচ্চবর্ণ এবং ব্যবসায়ীদের স্বার্থরক্ষাকারী দল। শহরভিত্তিক দল। গ্রামের গরীব মানুষের জন্য বন্ধুদল নয় বিজেপি'। কিন্তু নির্বাচনী ফলাফলের ভোট শেয়ার বিশ্লেষণ করে দেখা যাচ্ছে, কারও কথাই বিশ্বাস করে নি কেউ, বিশাল অংশের মানুষের কাছে মোদীই হয়ে উঠেছেন 'সবার বিশ্বাস'। আর এই 'সবার বিশ্বাস'ই মোদী ২.০-র মূল স্লোগান এবং ২০২৪ লোকসভা নির্বাচনের টার্গেট। যদিও প্রাথমিক ধাক্কা সামলে নিয়ে দেশে ও দেশের বাইরে, লেফট লিবারালদের দাবি মোদীর এই সাফল্য সাময়িক, দীর্ঘস্থায়ী নয়।

বিরোধীদের এই ফুলটস-কে ছক্কা মেরে উড়িয়ে দিয়ে সংসদের সেন্ট্রাল হলে এক কদম এগিয়ে নরেন্দ্র মোদী সুর বেঁধে দিয়েছেন পরবর্তী লোকসভা নির্বাচনের। সেন্ট্রাল হলে দাঁড়িয়ে তাঁর প্রত্যয়ী ঘোষণা—

• দেশের সংখ্যালঘু মানুষের সঙ্গেও ছলনা করা হয়েছে। ওঁদের শিক্ষা দেওয়া হয়নি। কাল্পনিক ভয়ের বাতাবরণ তৈরি করে ওঁদের ভোটব্যাঙ্ক হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। এই ভেদাভেদ সরিয়ে পারস্পরিক বিশ্বাসের পরিবেশ তৈরি করতে হবে।

• মহাত্মা গাঁধী, দীনদয়াল উপাধ্যায় এবং রামমনোহর লোহিয়া— এঁদের আদর্শে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে দেশকে।

• যদি কোনও ভুল হয়, তবে তা শুধরে নিয়ে এগিয়ে চলতে হবে।

• সমতা আর মমতা, এই দুই লক্ষ্যেই কাজ করতে হবে।

• নির্বাচন বিভাজন তৈরি করে নয়, শিবজ্ঞানে জীবসেবাই আমার লক্ষ্য।

২০১৪-র পর এই প্রথম নরেন্দ্র মোদী সরাসরি মুসলমান সম্প্রদায়কে কাছে টেনে নিচ্ছেন। তাঁদের পাশে দাঁড়ানোর আশ্বাস দিচ্ছেন। যেটা মধ্যবিত্ত শ্রেণির জন্য করেছিলেন ২০১৪ সালে। তখনও পর্যন্ত মোদী এবং আরএসএস-বিজেপির বিরুদ্ধে জোরালো প্রচার ছিল যে তাঁরা ঘোর মুসলমান বিরোধী। কিন্তু ২০১৪-১৯ মোদী প্রমাণ করেছেন তিনি সবার প্রধানমন্ত্রী। তার স্পষ্ট প্রতিফলন দেখা গেছে ২০১৯ লোকসভা নির্বাচনের ফলাফলে। ২০১৪ সাল থেকে মুসলিম ভোটাররা প্রথম সরতে থাকে বিজেপির দিকে। ২০১৯ লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির মুসলিম ভোট শেয়ার ৮ শতাংশ, ২০১৪-র পুনরাবৃত্তি, কিন্তু উল্লেখযোগ্য ভাবে মুসলিম ভোট শেয়ার কমেছে কংগ্রেসের। ভাগ হয়ে গেছে শক্তিশালী আঞ্চলিক দল বা অকংগ্রেসি দলের মধ্যে। এই মুসলমান মানুষদের মধ্যে বিজেপি নিয়ে ভয় কাটিয়ে তাঁদেরও কাছে টেনে নিতে কোমর বেঁধে নেমেছেন। খুব শীঘ্রই উত্তরাখন্ডে মাদ্রাসা খুলতে চলেছে মুসলিম রাষ্ট্রীয় মঞ্চ (আরএসএস অনুমোদিত সংস্থা)। এ নিয়ে এখনও পর্যন্ত দেশে আরও পাঁচটি মাদ্রাসা খুলেছে মুসলিম রাষ্ট্রীয় মঞ্চ। ধর্মীয় শিক্ষার পাশাপাশি এসব মাদ্রাসায় থাকবে সাধারণ স্কুল শিক্ষা এবং কম্পিউটার শিক্ষা। এইসব 'হিন্দুস্তানি' মাদ্রাসার সাংগঠনিক জাতীয় নেতা তুষার কান্ত হিন্দুস্তানির দাবী— "এখান থেকে পড়াশুনা করে বাচ্চারা শুধু যেন কাজী-কারী-ইমাম-মৌলানা-মুফতি না হয়। তারা যাতে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, বিজ্ঞানী বা অন্যান্য পেশাতেও যেতে পারেন সেটা সুনিশ্চিত করাই আমাদের উদ্দেশ্য"।

বাংলায় অশ্বমেধ

এ যেন এক অশ্বমেধ যজ্ঞের লাইভ টেলিকাস্ট। ২০১৪ সালে যাদের মাত্র ২টি লোকসভা আসন এবং ১৭ শতাংশ ভোট ছিল, সেই তাঁরাই আজ বাম-কংগ্রেসকে অনেক পিছনে ফেলে ৪০ শতাংশ ভোট নিয়ে রণহুঙ্কার দিচ্ছে তৃণমূলের ৪৩ শতাংশ ভোটব্যাঙ্ককে। ২০১৪ সালে যা ছিল ৩৯ শতাংশ। সিপিএম-র ভোট কমেছে ২৩ শতাংশ এবং কংগ্রেসের ৩ শতাংশ। সিপিএম-র যতটা কমেছে, ঠিক ততটাই বেড়েছে বিজেপির। কিন্তু তাতে তো মমতার খুশি হবার কথা। তিনি তো চেয়েছিলেন এ রাজ্যে সিপিএম নির্মূল হয়ে যাক এবং সেটা হয়েছে। মিলে গেছে বিজেপির ঘোষিত দাবির সঙ্গে। তাঁরাও চায় দেশ জুড়ে দুর্বল হোক কম্যুনিস্ট ও কংগ্রেস। তাহলে অশ্বমেধ যজ্ঞে বলি কারা হল? তৃণমূল না সিপিএম?

আসলে যেটা হল, সিপিএম-কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠান বিরোধী ভোট ভাগাভাগি হয়ে ঢুকে গেল বিজেপি-তৃণমূলের ঘরে। সিপিএম-কংগ্রেসের হিন্দু ভোট প্রায় সবটাই চলে গেল বিজেপির ঘরে। ২০১৯-এ হল ৫৭ শতাংশ, ছিল ২১ শতাংশ। আর সিপিএম-কংগ্রেসের মুসলমান ভোট প্রায় ধুয়ে মুছে চলে গেল তৃণমূলে। ২০১৯-এ হল ৭০ শতাংশ। ছিল ৪০ শতাংশ। সুতরাং অশ্বমেধ যজ্ঞে সম্প্রদায় ভোট ভাগাভাগি সম্পূর্ণ। এলাকা দখলের লড়াইও সম্পূর্ণ। রাজ্যের উত্তর ও পশ্চিম অঞ্চলে বিজেপির আধিপত্য। যদিও গেরুয়ার বিস্তার মধ্য ও পূর্বের-ও কিছু এলাকায়, তৃণমূলের আধিপত্য মূলত দক্ষিণবঙ্গ, কলকাতাসহ দক্ষিণ ২৪ পরগনায়। সুতরাং ১০০ শতাংশ লাভবান বিজেপি ও তৃণমূল। গোটা ভোটটাই দুটি পার্টি মূলত ভাগ করে নিয়েছে। বাকিরা উড়ে গেছে মোদী-মমতার পারস্পরিক হুঙ্কারে। তাহলে? ২০২১-র আগেই কি রাজ্যে ক্ষমতার দখল নেবে বিজেপি? নাকি আবারো হিসাবনিকেশ উলটেপালটে দিতে পারেন মমতা?

প্রধানমন্ত্রীর শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে না গিয়ে মমতা প্রমাণ করলেন ৭০ শতাংশ মুসলিম ভোটের ভাঙন তিনি চান না এবং আগামীতে ৮ শতাংশ হারানো হিন্দু ভোট ফিরে পেতে মরণকামড় দেবেন। যদি না তার আগেই বিজেপির 'ম্যানড্রেক' মুকুল (রায়) ভাঙন ধরিয়ে দিতে পারেন বাংলার মুসলমান ভোট ব্যাঙ্কে। একদা মমতার বাংলা বিজয়ের প্রধান কারিগর জানেন কীভাবে ভোট করাতে হয়। সংখ্যালঘু ভোটব্যাঙ্ক এবং সংখ্যালঘু তৃণমূল নেতাদের কাছে তিনি বরাবর বিশ্বস্ত মুখ। কতটা ড্যামেজ তিনি কত তাড়াতাড়ি করতে পারেন সেটাই এখন দেখার অপেক্ষা।

অথবা এমনটাও হতে পারে, আগামী ৫ জুন লোকসভা অধিবেশন বসার সঙ্গে সঙ্গেই মোদীর পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী শুরু হয়ে যাবে, 'লুক ইস্ট' বা 'অ্যাক্ট ইস্ট' পলিসির কর্মযজ্ঞ। বঙ্গোপসাগরকে কেন্দ্র করে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অর্থনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক রূপরেখা বদলে দিতে চলেছে এই স্বপ্নপ্রকল্প। গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে হলদিয়া বন্দর। যোগাযোগের অন্যতম হাব হয়ে উঠবে কলকাতা। উৎপাদন প্রক্রিয়ায় অংশ নেবে উত্তরবঙ্গসহ ওড়িশা, ত্রিপুরা এবং সমগ্র উত্তর-পূর্ব ভারত।

গোটা দেশে নিজেকে রাজনৈতিক ভাবে 'হিন্দুস্তান কি সিকান্দর' প্রমাণ করে মোদী শুধু দ্বিতীয়বারের জন্য দেশের প্রধানমন্ত্রী হলেন, এমনটা নয়। তিনি প্রমাণ করলেন তিনি সেই চারজন আন্তর্জাতিক নেতার মধ্যে একজন, যারা একসঙ্গে আগামী পৃথিবীকে শাসন করবেন— ডোনাল্ড ট্রাম্প, ভ্লাদিমির পুটিন, নরেন্দ্র মোদী এবং বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু। কিন্তু এই চাঁদ সদাগরের বাংলায়, 'হিন্দুস্তান কি সিকান্দর' কোন পথে ভাসাবেন তাঁর বাণিজ্য তরণী? 'নাগকন্যা' কিন্তু এখনও অনড়।

নির্বাচন রাজনীতির পাচন

উত্তরে কি শোধরাবেন? নাকি ছেড়ে দেবেন?

সৌমেন নাগ

লোকসভার নির্বাচনে নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে বিজেপির এই চোখ ধাঁধানো সাফল্য অনেককেই হতবাক করে যে দিয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। তবে তার থেকেও এই নির্বাচনের ফল দেশের অনেক রাজনৈতিক দলের অস্তিত্বের প্রশ্নটি বড় করে উপস্থিত করেছে। সারা ভারতের নির্বাচন নিয়ে আলোচনার আগে নিজ রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ এবং তার থেকেও তার উত্তরাংশে যে বিজেপির একচ্ছত্র সাফল্য তাকে এই প্রসঙ্গে আলোচনার দরবারে উপস্থিত করা যাক। কারণ উত্তরবাংলা থেকে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রিয় রাজনৈতিক বিচরণ ক্ষেত্র রূপে চিহ্নিত সেখানে তার দল যে ভাবে সমূলে উৎপাটিত হয়েছে তা যেমন তার কাছে কল্পনার বাইরে ছিল তেমনই বিজেপির এই বিজয় রথ রাজ্যের আগামী রাজনীতিতে এক সুদূর প্রসারী প্রভাবের সূচনা বলে চিহ্নিত হবে বলে মনে হয়।

রাজ্যের ক্ষমতার সিংহাসন দখল করার অনেক আগে থাকতেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় উত্তরবাংলাকে বিশেষভাবে নজর দিতে শুরু করেছিলেন। সেটা যতখানি এর প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের টানে তার থেকে অনেক বেশি ছিল এখানকার রাজনৈতিক মাটিতে তার দলীয় সংগঠনের বীজ বপন করে তাকে লালন করা। উত্তরবাংলায় চা-বলয়ে আরএসপি নিয়ন্ত্রিত ট্রেড ইউনিয়নগুলি সিপিএমের সম্প্রসারণবাদী আক্রমণের শিকার হয়ে শুধু যে দুর্বল হচ্ছে তা নয়, বামদলগুলির মধ্যে এই পারস্পরিক আত্মঘাতী লড়াইতে উভয়েই দুর্বল হচ্ছিল। বিশেষ করে আরএসপি নিয়ন্ত্রিত ট্রেড ইউনিয়নগুলি সিপিএমের এই মারমুখী আক্রমণের হাত থেকে বাঁচতে নিরাপত্তার আশ্রয় খুঁজে চলেছিল। ফরওয়ার্ডব্লক ও সিপিএমের পারস্পরিক দ্বন্দ্বও তৃণমূলকে এই জেলায় দলীয় সংগঠনের প্রভাব বিস্তারের সম্ভাবনাকে আশাবাদী করে তুলেছিল।

নন্দীগ্রাম ও সিঙ্গুরের আন্দোলনের ঢেউ উত্তরবঙ্গের মালদা জেলা ছাড়া জলপাইগুড়ি, দিনাজপুরের জনজীবনে ধাক্কা দিচ্ছিল তা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের চোখে ধরা পড়তে অসুবিধা হয়নি। পশ্চিমবঙ্গের ক্ষমতা দখলের পর তিনি উত্তরবাংলার এই উর্বর-রাজনৈতিক কর্ষণ ভূমিতে তার তৃণমূলের ঘাসফুলের চাষ অত্যন্ত সফলভাবে শুরু করেছিলেন। মালদা জেলার গনি খানের প্রভাবে কংগ্রেস, উত্তর দিনাজপুরে প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সীর নামের দাপটকে টপকে সরাসরি দখল করতে পারেননি। তবে আজকের ক্ষমতার প্রাসাদ থেকে প্রসাদের লোভে বিপক্ষ দলের নেতাদের দলত্যাগ ঘটিয়ে নিজ দলীয় ভাণ্ডারকে পুষ্ট করার রাজনীতিতে এখন অতি সহজ ব্যাপার। সেই কৌশলে তার দল সফল হয়েছিল। উত্তরবাংলার রাজনৈতিক বিন্যাসের দিকে একপলক দৃষ্টি দিলেই দেখা যাবে আজকে যারা ক্ষমতাসীন তৃণমূলের নানা ক্ষমতার আসনগুলি অলংকৃত করে আছেন তাদের অধিকাংশই কিন্তু এই দলটির গঠনের সময়ে সঙ্গে ছিলেন না। তারা দলে যোগ দিয়েছেন তৃণমূল ক্ষমতায় আসার পর তাদের যখন রমরমা অবস্থা তখন। তৃণমূলের অবয়ব বৃদ্ধি কতখানি মাংসপেশীর স্বাস্থ্য বৃদ্ধি বা কতখানি মেদ সঞ্চয় জনিত বৃদ্ধি তার প্রমাণ কিন্তু এই নির্বাচনের ফলাফলে পরীক্ষার সময় এসেছে।

কোচবিহার

যদিও লোকসভার এই নির্বাচন সারা দেশের রাজনৈতিক বিন্যাসের গতি প্রকৃতির ছবি, তবে এই প্রতিবেদনটির সীমা উত্তরবাংলার আটটি লোকসভা কেন্দ্রের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখা হল। এর মধ্যে দার্জিলিং হাসছে— এই দাবি কতখানি হাসির সাফল্য এনে দিতে পারল তার ওপর এই প্রতিবেদনে বিশেষভাবে আলোকপাত করা হল।

কোচবিহার কেন্দ্রে যে দু'জন প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী পরস্পরের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন তাঁরা দু'জনেই কিন্তু দলত্যাগী। একজন পরেশ অধিকারী। ছিলেন ফরওয়ার্ড ব্লকের কেন্দ্রীয় নেতা। যোগ দিয়েছেন বছরখানেক আগে তৃণমূলে। অপরজন নিশীথ প্রামাণিক। ছিলেন তৃণমূলের জেলা যুব নেতা। নির্বাচনের কয়েক মাসে আগে তৃণমূল থেকে বহিস্কৃত হয়ে বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন। দুই দলত্যাগীর এই লড়াই রাজ্যের সবার কাছে ছিল অত্যন্ত কৌতূহলের বিষয়। কারণ, এই দুই দলত্যাগীদের মনোনয়ন নিয়ে উভয় দলের পুরনো সদস্যদের মধ্যে ছিল ক্ষোভ। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক নিশীথ প্রামাণিক দলের এই ক্ষোভ অনেকটাই মিটিয়ে নিতে পারলেও পরেশ অধিকারী সেই ক্ষোভ কতখানি প্রশমিত করতে পেরেছেন তা নিয়ে তৃণমূলের অন্দরমহলে আলোচনা ইতিমধ্যেই দলীয় সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক দোষারোপে পরিণত হয়েছে। এই নির্বাচনে নিশীথ প্রামাণিক পরেশ অধিকারীকে ৫২২৯৫ ভোটের ব্যবধানে পরাজিত করে কোচবিহারের মাটিতে ঘাসফুলের উচ্ছেদ ঘটিয়ে পদ্মফুলকে ফোটাতে পেরেছেন। উল্লেখযোগ্য ঘটনা হচ্ছে কোচবিহারের বর্তমানের সর্বাধিনায়ক তৃণমূলের মন্ত্রী (উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর) রবীন্দ্র নাথ ঘোষের খাস নির্বাচনী ক্ষেত্র নাটাবাড়ি বিধানসভার নির্বাচন ক্ষেত্র থেকেই নিশীথ প্রামাণিক তৃণমূলের প্রার্থী থেকে ১৮৫২৫ ভোটে এগিয়ে থেকে আগামী বিধানসভা নির্বাচনে মন্ত্রীর কপালে চিন্তার ভাঁজ ফেলে দিয়েছেন।

আলিপুরদুয়ার

বাঙালি মধ্য ও নিম্নবিত্ত অধ্যুষিত সদ্য সৃষ্ট আলিপুরদুয়ার জেলার সদর শহর আলিপুরদুয়ার চা-বাগিচার আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মিশ্রিত নির্বাচন কেন্দ্র। এখানে আরএসপি নিয়ন্ত্রিত চা-বাগিচা শ্রমিক সংগঠন ছিল খুব শক্তিশালী এবং এই কেন্দ্র ছিল তাদের দখলে। সিপিএমের সর্বগ্রাসী

রাজনৈতিক দাপটে তাদের সংগঠনে যে ভাঙন শুরু হয়েছিল তাদের অনেকেই সেই আক্রমণের হাত থেকে বাঁচতে তৃণমূল ক্ষমতায় এলে তৃণমূলে আশ্রয় নিয়েছিল। তৃণমূলও সিপিএমের পথ অনুসরণ করে সিপিএমের চা-শ্রমিক সংগঠনগুলিকে ভেঙে দখল নিতে শুরু করেছিল। কিন্তু চা-শ্রমিকদের দীর্ঘদিনের দাবি তাদের ন্যুনতম মজুরি বৃদ্ধি তা সরকারি কর্মীদের মহার্ঘভাতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রের মতই আমল পায় নি। ফলে শ্রমিকদের ক্ষোভ যে পুঞ্জীভূত হচ্ছিল তা প্রকাশ পেল এই নির্বাচনের ফলাফলে। এখানে বিজেপির প্রার্থী জন বার্লা তৃণমূলের দশরথ তিরকিকে ২৩৮৭৯৬ ভোটের ব্যবধানে পরাজিত করে পদ্মফুলের বিজয় রথের চাকাকে আরও বেগবান করেছেন। শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি উন্নয়ন পর্ষদের সভাপতি তথা আলিপুরদুয়ার বিধানসভার বিধায়ক সৌরভ চক্রবর্তীর কেন্দ্র থেকেই বিজেপি প্রার্থীর ৩৬০৫০ ভোটে এগিয়ে থাকা এই বিধানসভার আগামী নির্বাচনে যে তৃণমূলের বর্তমান বিধায়কের ভবিষ্যতকে অনিশ্চয়তার মুখে ঠেলে দিয়েছে তা বলাই বাহুল্য মাত্র।

জলপাইগুড়ি

উত্তরবঙ্গের গুরুত্বপূর্ণ জেলা জলপাইগুড়ি। রাজনৈতিক চেতনার ক্ষেত্রে জলপাইগুড়ির ঐতিহ্য নিয়ে কোনও দ্বিধা নেই। এই কেন্দ্রের জনবিন্যাস মিশ্র হলেও উত্তরবাংলার অন্যতম প্রধান জনগোষ্ঠী রাজবংশী এই কেন্দ্রে সংখ্যাগরিষ্ঠ। এখানে তৃণমূলের বিজয়চন্দ্র বর্মণ ছিলেন গতবারের সাংসদ। এবার, বিজেপি প্রার্থী জয়ন্তকুমার রায় তাকে ১৭৬০৮৮ ভোটের ব্যবধানে পরাজিত করে ঘাসফুলকে উৎপাটিত করেছেন। এই কেন্দ্রে আছেন ফুলবাড়ি-ডাবগ্রাম বিধানসভা কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত আরেক মন্ত্রী গৌতম দেব। তার কেন্দ্র থেকেই ৮৬ হাজারের বেশি ব্যবধানে জয়ন্ত রায় এগিয়ে গেছেন। জলপাইগুড়ি পুরসভা তৃণমূলের দখলে। অথচ এই পুরসভার ২৫টি ওয়ার্ডেই বিজেপি প্রার্থী এগিয়ে রয়েছে। এখানকার ৭টি বিধানসভা কেন্দ্রের মধ্যে একমাত্র রাজগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্র ছাড়া বিজেপি প্রার্থী সর্বত্র এগিয়ে রয়েছেন। ফলে আগামী বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূলের ভবিষ্যতের ওপর এই এই কেন্দ্রগুলি যে দুশ্চিন্তার গভীর কালো মেঘে ঢেকে দিয়েছে তা জানতে রাজনৈতিক পণ্ডিত হবার প্রয়োজন হয় না।

রায়গঞ্জ

প্রয়াত কংগ্রেস নেতা প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সীর যত্নের লোকসভা কেন্দ্র গত নির্বাচনে প্রিয়রঞ্জনের জায়া দীপা দাশমুন্সী সিপিএম প্রার্থী মহঃ সেলিমের কাছে সামান্য ভোটে পরাজিত হয়েছিলেন। এবারও এই দুজন প্রার্থী হয়েছিলেন। এছাড়া কংগ্রেস থেকে দলত্যাগী ইসলামপুর পুরসভার চেয়ারম্যান কানাইলাল আগরওয়াল তৃণমূলের প্রার্থী হয়েছিলেন। রাজনৈতিক পণ্ডিতদের ধারণা ছিল এই নির্বাচনে মূল প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে সিপিএম ও তৃণমূলের প্রার্থীদের মধ্যে। অথচ বিজেপি তাদের সাংগঠনিক ক্ষমতা এত গভীরে প্রোথিত করেছে যে প্রায়-অচেনা প্রার্থী দেবশ্রী চৌধুরী তৃণমূল প্রার্থী কানাইলাল আগরওয়াল-এর থেকে ৬০৫৭৪ বেশি ভোটের ব্যবধানে পরাজিত করে সিপিএমের শক্তিশালী প্রার্থী মহঃ সেলিমের জমানত পর্যন্ত বাজেয়া প্ত হতে বাধ্য করেছেন। কী করে 'ভূমিপুত্র' কানাইলাল আগরওয়ালকে টেক্কা দিয়ে বলতে গেলে বহিরাগত প্রার্থী দেবশ্রী চৌধুরী এখান থেকে পাঁচ লক্ষেরও বেশি ভোট পেলেন এবং তৃণমূলের বিরুদ্ধে মানুষের ক্ষোভ কোথায় পৌঁছালে এই ফল হতে পারে তার সমীক্ষা প্রয়োজন।

বালুরঘাট

এতদিন মনে করা হত এই কেন্দ্রটি আরএসপি-র এক শক্ত ঘাঁটি। ২০১৪ সালের লোকসভার নির্বাচনে মমতা হাওয়ায় সেই ধারণা ভেঙে যায়। নাট্য ব্যক্তিত্ব কলকাতা নিবাসী অর্পিতা ঘোষ এখান থেকে লোকসভায় নির্বাচিত হয়ে বামদল কোদাল বেলচার চাষে ঘাসফুলের সৌরভ ছড়িয়েছিলেন। এবারের নির্বাচনে বিজেপি প্রার্থী তাকে ৩৩২৯৩ ভোটের ব্যবধানে পরাজিত করে দক্ষিণ দিনাজপুরে আগামী বিধানসভার নির্বাচনে পদ্মের সৌরভ প্রসারিত করার সম্ভাবনাকে দৃঢ় করেছেন। অর্পিতা ঘোষ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের খুব কাছের লোক বলে পরিচিত। স্থানীয় তৃণমূল নেতাদের দাবিকে অগ্রাহ্য করে তিনি তাই তাকে আবার মনোনয়ন দিয়েছিলেন। তাকে জেতাবার জন্য ছুটে এসেছেন বালুরঘাটে। ভোটারদের কাছে আবেদন করেছিলেন তাকে সমর্থনের জন্য। বালুরঘাটের এই কেন্দ্রটি একদিকে দেশভাগে উদ্বাস্তু বাঙালি ও অধিবাসী অধ্যুষিত এলাকা। মুখ্যমন্ত্রীর আবেদন যে তাদের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি, নির্বাচনের ফলাফলেই তার প্রমাণ। অন্তর্দ্বন্দ্বের যে কারণের কথা বলা হচ্ছে সেটা তো এখন সব দলেরই সহজাত ভূষণ। নরেন্দ্র মোদীর হাওয়া নাট্য আন্দোলনের জন্য খ্যাত বালুরঘাট শহর সহ অধিবাসীদের মধ্যে যে প্রভাব ছড়াতে পেরেছে সেই সত্যটি স্বীকার করে নেওয়া ভাল।

মালদহ উত্তর

মালদহ জেলার সঙ্গে গনিখান চৌধুরীর নাম যেন অনেকটা এক হয়ে আছে। বিশেষ করে গনিখান চৌধুরী কংগ্রেস আমলে রাজ্যের মন্ত্রী এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভায় রেলমন্ত্রী হিসাবে মালদহের জন্য যা করেছেন তা তাকে মালদার সঙ্গে সমার্থক করে তুলেছিল। অথচ এই মালদহ কিন্তু একসময় কমিউনিস্ট আন্দোলনের শক্তিশালী কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল। বিমল দাস, শচী রায়, দীনেশ জোয়ারদার ইত্যাদির মতন কমিউনিস্ট নেতৃত্ব এই জেলায় নেতৃত্ব দিয়েছেন। আদিবাসী অধ্যুষিত হাবিবপুর ছিল কমিউনিস্টদের শক্ত ঘাঁটি। আজকের বিজেপি প্রার্থী খগেন মুর্মুই তো ছিলেন হাবিবপুর থেকে সিপিএম বিধায়ক। তিনি তৃণমূলের প্রার্থী মৌসম নুরকে ৮৪২৮৮ ভোটে হারিয়েছেন।

মালদহ দক্ষিণ

এখান থেকে কংগ্রেস প্রার্থী আবু হাসেন খান চৌধুরী বিজেপি-র রূপা মিত্র চৌধুরীকে ১১৩৩৮ ভোটের ব্যবধানে পরাজিত করেছেন। উল্লেখযোগ্য এই কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী মোয়াজ্জম হোসেন তৃতীয় স্থানে আছেন।

দার্জিলিঙে হাসির নিচে কান্না

দার্জিলিং লোকসভা কেন্দ্র নিয়ে বিশেষভাবে আলোচনা করার প্রয়োজন, কারণ এই জেলা বিশেষ করে পাহাড় নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একের পর এক রাজনৈতিক কৌশল ঘোষণা করেছেন। এবং তার দাবি ছিল পাহাড় সংক্রান্ত তার প্রতিটি সিদ্ধান্তই সফল হয়েছে এবং তিনি পাহাড়ের এতদিনের সমস্যার সমাধান ঘটিয়ে সেখানে স্থায়ী শান্তি এনেছেন। পাহাড় আজ হাসছে যেমন জঙ্গলমহলে তিনি হাসি ফোটাতে পেরেছেন।

মুখ্যমন্ত্রীর সদিচ্ছা নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই। পাহাড়ের সমস্যা নিয়ে তার ভবানা নিয়েও প্রশ্ন করার জায়গা নেই। কিন্তু ইচ্ছা থাকলেই তো হয় না তার জন্য প্রয়োজন স্বার্থহীনভাবে নীতি রূপায়ণ। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মধ্যে একটা ভয়ঙ্কর রকম কর্তৃত্ববাদী মানসিকতা বহু ক্ষেত্রে তাকে অহংবোধের তাড়নায় কোনও বিষয়ের সমাধানের ক্ষেত্রে চটজলদি সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রচারের মুখ দেখাতে প্ররোচিত করে, সেই মানসিকতা যে বিপর্যয় টেনে আনতে পারে তার উদাহরণ দার্জিলিং লোকসভা কেন্দ্রের ফল।

পাহাড়ের সমস্যাটি আইন-শৃঙ্খলার সমস্যা নয়। এমন কী এই সমস্যা জঙ্গল মহলের আদিবাসী অধ্যুষিত জনজাতির আর্থিক উন্নয়নের বিষয় থেকে আলাদা। ১০০ বছরেরও বেশি গোর্খাল্যান্ড রাজ্য গঠনের দাবির

পেছনে যে জাতিসত্ত্বার ভাবাবেগ এখানকার পাহাড়ি জনজীবনে অস্থির ঢেউ সৃষ্টি করে চলেছে সেই ভাবাবেগ তো শুধু এই পাহাড়ির সমস্যা নয়। এই অস্থিরতা তো সারা বিশ্ব জুড়ে। এর সমাধানে শুধু উন্নয়নের কর্মসূচীর ঘোষণায় ভাবাবেগের এই অস্থিরতাকে প্রশমিত করা যায় না। প্রথমেই জাতিসত্ত্বার এই দাবির উৎস ও তার চরিত্রকে বোঝা প্রয়োজন।

এরা বিচ্ছিন্নতাবাদী। বিচ্ছিন্নতাবাদকে উপড়ে ফেলতে সমতলের সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালি কর্তৃত্ববাদের রথে চড়ে পাহাড়ি জনজাতির মধ্যে নানা বিভেদের কৌশল কার্যকরী ফল দিতে পারে না।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যখন রেলমন্ত্রী ছিলেন, তার রাজনৈতিক পরিচয় ছিল তিনি প্রচণ্ডভাবে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে বামফ্রন্টের বিরোধী। সেই সময় বিজেপির সহযোগী তৃণমূল তথা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দার্জিলিং পাহাড়ে এসে সদ্য নেতৃত্বে আসার চেষ্টায় বিমল গুরুং ও তার সমর্থক পাহাড়ি জনতার কাছ থেকে সম্বর্ধনায় আপ্লুত হতেন। ধরে নিয়েছিলেন পাহাড়ের জনতার কাছে তিনি খুবই জনপ্রিয়।

এই আপাত জনপ্রিয়তার প্রেক্ষাপট তিনি বুঝতে পারেননি। সে সময় দার্জিলিং পাহাড়ে সুবাস ঘিসিং-এর বিরুদ্ধে বিমল গুরুং-এর নেতৃত্বে সংগঠন গড়ে উঠছে। মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য সুবাস ঘিসিং-এর মাথার ওপর প্রশাসনকি ছাতা ধরে তাকে নানাভাবে সাহায্য করে চলেছিলেন। ফলে সে দিনের বিমল গুরুং-এর গোর্খা ন্যাশনাল ফ্রন্টের লড়াই হয়ে দাঁড়িয়েছিল সিপিএম তথা বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের বিরুদ্ধে। বামফ্রন্ট ও বুদ্ধদেব বিরোধী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাই তখন সুবাস ঘিসিং বিরোধী পাহাড়ি জনতার কাছ থেকে অভিনন্দন পেয়ে চলেছিলেন।

এই অভিনন্দন যে প্রকৃত অভিনন্দন নয় এটা সুবাস ঘিসিং-এর বিরুদ্ধে প্রবাহমান পাহাড়ের জনতার সিপিএম তথা বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য বিরোধী মনোভাবের প্রকাশ ছিল। মমতা দেবী যখন পাহাড়ে যেতেন তখন পাহাড় থেকে উচ্ছেদ হবার ক্ষোভে সমতলে তার পাহাড়ে যাওয়ার বিরুদ্ধে সিপিএমের পোস্টার পড়ত। দেওয়াল লিখন হত 'বাঙালি রক্ত দেবে বাংলা ভাগ হতে দেবে না'। এটা যে সমতলের বাঙালি বনাম পাহাড়ের মানুষের লড়াই নয় তা সিপিএমের নেতৃত্ব জানতেন না তা নয়। স্তালিনবাদী কমিউনিস্ট সিপিএম তো স্তালিনের জাতিসত্ত্বার লেখার সঙ্গে পরিচিত। তাদের নেতৃত্বেই তো অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টিতে পৃথক গোর্খাল্যান্ডের দাবিকে সমর্থন জানিয়েছিলেন। তবু সমতলের ২৯২টি আসনের মধ্যে পাহাড়ে পড়ে মাত্র তিনটি আসন। তাই নির্বাচনে যখন জেলাটাই মূল লক্ষ্য তখন তিনটি আসন বনাম সমতলের ২৮৯টি লড়াইতে সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনের পক্ষে থাকাই নিরাপদ।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যতই সিপিএম বিরোধী হন না কেন ভোট সংগ্রহের ক্ষেত্রে একই পথ অনুসরণ করেন। যদি সেই বাঙালি ভাবাবেগের রথে চড়ে ভোট বৈতরণী পার হতে সুবিধা হয় তবে সেখানে বিরোধ কোথায়?

সেদিনকার পাহাড়ের জনতার সেই অভিনন্দন যে তাদের মনের ভাষা নয়, জাতিসত্ত্বার প্রশ্নটি গভীরভাবে প্রোথিত হয়ে আছে সেই সত্যটি মমতাদেবীর ভাবনায় পৌঁছে দেবে কে? স্তাবকেরা যদি স্তুতিগানের মধ্যে সব কিছুতেই 'হ্যাঁ' বলে তাদের আসন টিকিয়ে রাখতে চায় তবে সত্যি কথা বলতে এগিয়ে আসবে কে?

স্তাবকতার স্তবগানে তো সবাই আপ্লুত হয়। ক্ষমতার প্রসাদভোগীরা তা জানে। চার্বাক হতে কে এগিয়ে আসবে? যুধিষ্ঠির কুরুক্ষেত্র যুদ্ধজয়ের পর ব্রাহ্মণদের নানা দানসামগ্রী দিয়ে তাদের প্রশংসার স্রোতে ভেসে এসেছিলেন। চর্বাক সেখানে অযাচিত ভাবেই উপস্থিত হয়ে যুধিষ্ঠিরকে বলেছিলেন, 'মহারাজ এই সব সমবেত ব্রাহ্মণরা তোমার কাছ থেকে দান সামগ্রীতে তাদের ঝোলা ভরাতে তোমাকে এমন ঊর্দ্ধবাহু হয়ে প্রশংসায় ভরিয়ে দিচ্ছে। দুর্যোধন যদি জয়ী হত তবে সেই হত দানসামগ্রীর লোভে ধর্মযুদ্ধের বিজয়ী নায়ক। আমি কিন্তু তোমার এই বিজয়মঞ্চের পেছনে এই যুদ্ধে যে সমস্ত হাজার হাজার মানুষের জীবনের বিনিময়ে তুমি জয়ী হয়েছ আমি তাদের স্বজনদের হাহাকার ও আর্তনাদ শুনতে পাচ্ছি। তাই তোমাকে প্রশংসা করতে পারলাম না। এই ব্রাহ্মণদের দানসামগ্রীর বিনিময়ে স্তুতিবাক্য শোনার থেকে তোমার যাওয়া উচিত সেই হাহাকাররত মানুষের মধ্যে।

পাহাড়ের এই সমস্যাকে জানতে যারা পাহাড় নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে ভাবছেন বা এই জাতিসত্ত্বা নিয়ে কাজ করছেন তাদের কাউকে মুখ্যমন্ত্রী ডাকার তাগিদ অনুভব করেননি। ক্ষমতার গর্বে তিনি পাহাড়ের মানুষকে ঘরের বাইরে সাজানো মঞ্চে বসেই ধরে নিয়েছিলেন তিনি এই পাহাড়বাসীর মনের দরজার ভিতর দিয়ে এদের অন্দরমহলে পৌঁছে গেছেন। যাকে তিনি পাহাড়ের দায়িত্ব দিয়েছিলেন সেই কলকাতার ভদ্রলোক টালিগঞ্জের রূপালি ভাবনায় এখানকার সমস্যা বুঝে গিয়েছেন বলে ধরে নিলেন। মুখ্যমন্ত্রীও চোখ দিয়ে না দেখে কান দিয়ে পাহাড় সমস্যাকে বুঝতে যে চেয়েছিলেন তা কিন্তু এই লোকসভার নির্বাচনের ফল চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে।

মহাভারতের সূত্রেই জানা যায় চর্বাককে হত্যা করার পেছনে যুধিষ্ঠিরের সমর্থন ছিল।

পাহাড়ের মানুষ যে হাসছে না, সেই হাসির নিচে যে কান্নার ফল্গুধারা বইছে তা মুখ্যমন্ত্রীর চোখে ধরিয়ে দিতে স্তাবকেরা এগিয়ে আসেনি। তারা ধরে নিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী তা পছন্দ করবেন না। পাহাড়ের এই সমস্যাকে জানতে যারা পাহাড় নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে ভাবছেন বা এই জাতিসত্ত্বা নিয়ে কাজ করছেন তাদের কাউকে মুখ্যমন্ত্রী ডাকার তাগিদ অনুভব করেননি। ক্ষমতার গর্বে তিনি পাহাড়ের মানুষকে ঘরের বাইরে সাজানো মঞ্চে বসেই ধরে নিয়েছিলেন তিনি এই পাহাড়বাসীর মনের দরজার ভিতর দিয়ে এদের অন্দরমহলে পৌঁছে গেছেন। যাকে তিনি পাহাড়ের দায়িত্ব দিয়েছিলেন সেই কলকাতার ভদ্রলোক টালিগঞ্জের রূপালি ভাবনায় এখানকার সমস্যা বুঝে গিয়েছেন বলে ধরে নিলেন। মুখ্যমন্ত্রীও চোখ দিয়ে না দেখে কান দিয়ে পাহাড় সমস্যাকে বুঝতে যে চেয়েছিলেন তা কিন্তু এই লোকসভার নির্বাচনের ফল চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে।

একটা কথা রাজনীতিতে চালু আছে অনেক ক্ষেত্রে জীবিত মানুষ থেকে মৃত মানুষ অনেক শক্তিশালী প্রভাব বিস্তার করে। বিমল গুরুঙের বিরুদ্ধে পাহাড়ে একটি ক্ষোভ ধুমায়িত যে হচ্ছিল এতে সন্দেহ নেই। মুখ্যমন্ত্রী কিন্তু সেই ক্ষোভের মেঘ জমা হবার সুযোগের অপেক্ষা না করে চূড়ান্ত অধৈর্যের পরিচয় দিয়ে তাৎক্ষণিক বর্ষণের আশায় পাহাড়ে জিএনএলএফ-এর মধ্যে ফাটল ধরাবার কৌশল অবলম্বন করতে বিনয় তামাংদের প্রশাসনিক নিরাপত্তার বলয়ে এনে বিমল গুরুংদের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক আক্রমণ চালালেন।

এখানেই দায়িত্ব ছিল তার পরামর্শদাতাদের প্রকৃত তথ্য হাজির করা। বলা দরকার ছিল তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী কাশ্মীরের প্রধানমন্ত্রী (কাশ্মীর রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে তখন প্রধানমন্ত্রী বলা হত) শেখ আবদুল্লাকে ক্ষমতাচ্যুত করে জেলে পাঠিয়ে বক্সী মহম্মদ গোলামকে সেই পদে বসিয়ে আবদুল্লার জনপ্রিয়তাকে আকাশচুম্বী করে দিয়েছিলেন। কাশ্মীরের জনতার কাছে শেখ আবদুল্লা রূপান্তরিত হলেন কাশ্মীরী জনতার ভাবনার প্রতীক-এ। কাশ্মীরের মানুষের জন্য তিনি জেলের জীবনকে বেছে নিয়েছেন। অপর দিকে কেন্দ্রীয় সরকারের নিরাপত্তা বলয়ের ছত্রছায়ায় বক্সী গোলাম কাশ্মীরের ক্ষমতায় বসে প্রশাসনের চাবির অধিকারী হলেন বটে তিনি কিন্তু কাশ্মীরী জনতার চোখে কাশ্মীরের নেতা হতে পারলেন না। তিনি চিহ্নিত হলেন কেন্দ্রীয় সরকারের এজেন্ট বা তল্পিবাহক রূপে।

বিমল গুরুং যতই রাজ্য সরকারের পুলিশের তাড়া খেয়ে আত্মগোপন করছিলেন ততই তিনি পাহাড়ের মানুষের কাছে তাদের জন্য সংগ্রামী বলে চিহ্নিত হচ্ছিলেন। অপর দিকে বিনয় তামাংরা যতই রাজ্য সরকারের কাছ থেকে প্রশাসনিক ছাতার তলে সুবিধা পাচ্ছিলেন ততই কিন্তু তারা পাহাড়ি জনতার স্বার্থবিরোধী ও রাজ্য সরকারের অনুচর বলে চিহ্নিত হয়ে পাহাড়ের সাধারণ মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে চলেছিলেন। আজ যে দার্জিলিং লোকসভা থেকে বিজেপি প্রার্থী রাজু বিস্তা তৃণমূলের অমর সিংহ রাইকে রেকর্ড ভোটের ব্যবধানে (৪১৩৪৪৩) পরাজিত করলেন এবং দার্জিলিং বিধানসভা কেন্দ্র থেকে বিজেপি প্রার্থী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের একান্ত কাছের এবং তৃণমূলের প্রার্থী বিনয় তামাংকেই ৪৬২৮৫ ভোটের ব্যবধানে পরাজিত করলেন তা তো মুখ্যমন্ত্রীর প্রতি পাহাড়ের অনাস্থারই প্রকাশ।

উত্তরবঙ্গের ৮টি লোকসভা আসনের মধ্যে ৭৫টি বিজেপি এবং একটি কংগ্রেস জয়ী হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর ঝোলা শূন্য। মুখ্যমন্ত্রীকে আত্মসমীক্ষায় বসতে হবে। ভাবতে হবে উত্তরবঙ্গ নিয়ে তার নীতি তথা কৌশলের ব্যর্থতার কারণগুলি নিয়ে। আগামী বিধানসভা নির্বাচনের জন্য এই ফল কিন্তু এক অশনি সংকেত।

এখন লাখ টাকার প্রশ্ন হল, মহানেত্রী কি সেই সংশোধনবাদী উত্তরণের পথে হাঁটবেন? প্রতিপক্ষ কি তাঁকে সেই অবকাশটুকু দেবে? এই প্রতিবেদন প্রেসে যাওয়া পর্যন্ত তিনি পাঠিয়ে দিয়েছেন উত্তরবঙ্গের প্রতি তাঁর অভিমান বার্তা! উত্তরের নেতাদের সরিয়ে উত্তরের দায়ভার দিচ্ছেন দক্ষিণের নেতাদের হাতে! কলকাতার সেই চূড়ান্ত ব্যর্থ নেতাকে ফের দায়িত্ব দিলেন উত্তরের? তার ফল বিপরীত হতে পারে জেনেও?

নির্বাচন রাজনীতির পাচন

সবুজ বাগিচায় কী করে ধরে গেরুয়ার রং

গৌতম চক্রবর্তী

বাইরে হিন্দিতে লেখা ‘শ্রী রাম বনবাসী আশ্রম’। শিলিগুড়ির গর্গ পরিবারের সাহায্যে নির্মিত। শক্তপোক্ত লোহার গেটের ভেতর থেকে আমাকে দেখে উঁকি দিচ্ছে বেশ কয়েকজোড়া আদিবাসি শিশুর অবাক করা চোখ। গেট খোলার আওয়াজে ঘর থেকে বাইরে এলেন এক মাঝবয়সী লোক। জানালাম আমি উত্তরবঙ্গের চা-বাগান এবং জনজাতিদের নিয়ে লেখালেখি করছি। তথ্য হিসাবে সন্দেহভাজন দৃষ্টিকে স্বাভাবিক করার জন্য বের করলাম ডিবিআইটি-এর সুমন্ত মুখার্জী এবং প্রখ্যাত চা-বিশেষজ্ঞ এবং গবেষক তথা সুলেখক রাম অবতার শর্মাজীর আমাকে দেওয়া লেখক হিসেবে তাদের অ্যাসোসিয়েশনের নামাঙ্কিত প্যাডে স্বীকৃতিপত্র এবং চা-বাগিচা নিয়ে আমার লেখা বইটি ‘চায়ের ডুয়ার্স কী চায়?’।

অখিল ভারতীয় বনবাসী কল্যাণ আশ্রম আরএসএস-এর শাখা। বনবাসী কল্যাণ আশ্রম গত চার বছর আগে ছাত্রাবাস খুলে বসেছে বানারহাট থানার গয়েরকাটার আমাডিপা গ্রামে। সাকোয়াঝোরা ১নং গ্রাম পঞ্চায়েতের আদিবাসি আশ্রমের কাজের এলাকা ডুয়ার্স জুড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। বছর চারেক আগে বালুরঘাট থেকে ছাত্রাবাসের দায়িত্ব নিতে এসেছিলেন রাম পাহান। লক্ষ্য ছাত্রাবাসকে সামনে রেখে সংঘ পরিবারের হিন্দুত্বের প্রচার বাড়ান। ছাত্রাবাস খুলে চলছে হিন্দুত্বের প্রচার। বাদ যায়নি চা-বাগান থেকে উঠিয়ে আনা শিশুরাও। হোস্টেলের ভেতরে শিশুদের থাকার ব্যবস্থা। খাটে টাঙ্গানো বিজেপির পদ্মফুল প্রতীক আঁকা পতাকা। এটা কী করে এখানে? শিশুদের জবাব আমরা তো এই পার্টির ইস্কুলে পড়ি। ছবি তুলতে গিয়ে বাধা পেলাম। বুঝলাম কিছু একটা অদৃশ্য নির্দেশ রয়েছে। সূত্রটা পেয়েছিলাম কলকাতা থেকে প্রকাশিত একটি দৈনিকের জলপাইগুড়ির সংবাদদাতার কাছ থেকে। গয়েরকাটা চা-বাগানে সমীক্ষা করতে গিয়ে তাই সরেজমিনে দেখতে চলে আসা।

রাম পাহান প্রথমে মুখ খুলছিলেন না। আমি নিজেও বিজেপি সমর্থক বলাতে এবং আরএসএসের প্রার্থনা সংগীত “নমস্তে সদা বৎসলে মাতৃভূমে” গড় গড় করে মুখস্থ বলাতে বুঝতে পারলাম ওষুধ ধরেছে। তারপরেই রাম পাহান-এর কাছ থেকে জানতে পারলাম আসল তথ্য। শিশুদের মধ্যে প্রতিদিন সেবার আড়ালে ঢালা হচ্ছে হিন্দুত্বের বাণী। সংঘ পরিবারের কাছে এটা কোনও অপরাধের পর্যায়ে পড়ে না। কারণ এটাই আরএসএস এর কর্মসূচী। ৩৫ জন আদিবাসি শিশুকে রাখা আছে সংঘের ছাত্রাবাসে। মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা হয়ে যাবার ফলে বেশ কয়েকজন বাড়িতে। খরচ আসে বানারহাট, বীরপাড়া, এবং শিলিগুড়ির বেশ কিছু ব্যবসায়ীর কাছ থেকে। তবে ছাত্রাবাস নয়, আসল লক্ষ্য ঠিক করে দিয়েছে আরএসএস। ছাত্রাবাসকে সামনে

রেখে বাড়াতে হবে বিজেপিকে। আলিপুরদুয়ার, শিলিগুড়ি এবং ডামডিমে কার্যালয় আছে এবং সেখান থেকেই আসে নির্দেশ এবং সেই নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করে যায় সংঘ কর্মীরা। ছাত্রাবাস তো লোক দেখানোর জন্য ঠিক আছে। তাহলে আসলে কী ধরনের কাজ হচ্ছে? প্রশ্ন শুনে জবাব, ভেতরের কাজের কথা বলছেন তো? ওটা তো হচ্ছে এবং ওটা তো হবেই। গ্রামে গ্রামে যাচ্ছি। বিজেপিকে ভোট দিতে বলছি। জানায় বালুরঘাট থেকে গয়েরকাটাতে আসা আরএসএস কর্মী।

বেরিয়ে পড়েছিলাম ভোটপর্ব পরবর্তীকালে ডুয়ার্সের আলিপুরদুয়ার এবং জলপাইগুড়ি লোকসভা কেন্দ্রে জনমত সমীক্ষার প্রতিফলন সার্ভে করতে। তখনি পেয়েছিলাম চোরাস্রোতের সন্ধান। দেখেছিলাম এক ভয়ঙ্কর রাজনৈতিক সমীকরণের প্রাকপ্রস্তুতি লগ্ন। টের পাচ্ছিলাম চা-বাগিচা বলয়ে এবারের লোকসভা নির্বাচনে জাতপাত এবং সাম্প্রদায়িকতা এক বিচিত্র কম্পোজিশন তৈরি করেছে। অনেক ভেবেও কূলকিনারা খুঁজে পাইনি যে বাঙালি, অবাঙালি, আদিবাসী এবং নেপালি ভোট এককাট্টা হয়ে যাবার রহস্যটা কোথায়। সেদিন আশ্রম থেকে বেরিয়ে গেটের কাছে দাঁড়ানো একজন একান্তে জানালেন, তৃণমূলের লোকজন রাতে আশ্রমে আসছে। ওরা তো আমাদের সব কাজ বোঝে না, আমাদের কী লক্ষ্য তাও জানে না। তবে ওরা এবার এসে বলে গেছে সব ভোট এবার বিজেপিতে।

গয়েরকাটা থেকে বের হয়ে চললাম আলিপুরদুয়ারের পথে। মফস্বলের রাস্তা হেলান দিয়ে থাকে ভুটান পাহাড়ের গায়ে। শহর ঘিরে ডুয়ার্সের জঙ্গল আর চা-বাগান। এই মনোরম সৌন্দর্য আর তার আড়ালে থাকা মন খারাপ নিয়ে সম্বৎসর পর্যটকদের আমন্ত্রণ জানায় আলিপুরদুয়ার। কেন মন খারাপ? আলিপুরদুয়ার লোকসভা কেন্দ্রে ৬২টা চা-বাগান। তার মধ্যে ১১টা বন্ধ। যেগুলি খোলা সেগুলোতেও শ্রমিকেরা ন্যুনতম মজুরি এবং চিকিৎসার সুযোগ থেকে বঞ্চিত। শ্রমিক সন্তানেরা স্থানীয় সরকারি স্কুলগুলোতে ভর্তি হয়। কিন্তু সেসব স্কুলের পরিকাঠামো ভাল না থাকার ফলে পড়াশোনা বেশিদূর এগোয় না। অনেক শ্রমিক মা বাবা কষ্ট করে বেসরকারি স্কুলে সন্তানকে ভর্তি করেন। কিন্তু তার খরচ অত্যন্ত বেশি বলে বেশিদিন টানতে পারেন না। তাই স্কুলছুট বাড়ে। অথচ দেশের চা-বাগান সংক্রান্ত আইন অনুযায়ী স্বাস্থ্য, রেশন, শিক্ষা, চিকিৎসা এসব কিছুই চা-শ্রমিকদের প্রাপ্য। তাই যে লোকসভার একটা বড় অংশ বিপন্ন চা-শ্রমিক, তার মন বিষণ্ণ হওয়াই স্বাভাবিক ঘটনা। তৃণমূল, বিজেপি, আরএসপি এবং কংগ্রেস ভোটের মাঠে প্রধান চারটি দলকে পড়তে হয়েছে চা-বাগানের শ্রমিক কর্মচারীদের অভাব-অভিযোগ, ক্ষোভ এবং প্রশ্নের মুখে। প্রত্যেকটি দলের প্রার্থী আশ্বাস দিয়েছিলেন তিনি জিতলে চা-শ্রমিকদের দুর্দশা মিটবে। তাই বাগিচার হাল ফেরাবার দায়ভার নিতেই ভোটে দাঁড়িয়েছিলেন সকলে।

প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের বিরুদ্ধেই কি গণরায়?

আসলে আলিপুরদুয়ার কেন্দ্রে অর্থাৎ দুটি পাতা একটি কুঁড়ির দেশে এবারের ভোটপর্বে ছিল এক নতুন লড়াই। প্রতিশ্রুতি রক্ষার সঙ্গে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের। চা বলয় অধ্যুষিত লোকসভার আনাচে-কানাচে চর্চা ছিল এটাই।

বিজেপির সাতটি চা-বাগান খুলতে না পারার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের পাশাপাশি অন্যদিকে ছিল রাজ্যের উদ্যোগে একের পর এক বাগান খুলে দেওয়ার লোকদেখানো নাটক। বাগান খোলে ঠিকই, আবার ভোটপর্ব সাঙ্গ হয়ে গেলে বাগান বন্ধ হয়ে যাবে এটা নিজেদের অভিজ্ঞতার আলোক থেকে বুঝতে পেরেছিলেন চা-শ্রমিকদের একাংশ। একদিকে ভূমিপুত্র তথা চা-বাগানের ঘরের ছেলে এবং অন্যদিকে হঠাৎ করে প্রচারে আসা বিতর্কিত নেতাকে নিয়ে প্রশ্ন ছিল অনেকগুলো। জন বারলা সম্পর্কে বিরোধী শিবিরের প্রচার ছিল যে তিনি যখন আদিবাসী বিকাশ পরিষদের নেতা ছিলেন তখন তিনি ছিলেন গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার বিরোধী। পরবর্তীকালে মোর্চার নেতা বিমল গুরুং যখন সমতলের ১২৬টি মৌজা সমেত গোর্খাল্যান্ডের দাবি তোলেন তখন তিনি তা সমর্থন করেন। তারপরে তিনি বিজেপিতে যোগদান করেন। পাল্টা যুক্তিতে জন বারলা প্রশ্ন তুলেছেন বিমল গুরুংয়ের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী করমর্দন করতে পারলে তিনি তাঁর সঙ্গে থাকতে পারবেন না কেন।

কংগ্রেস এবং বামের ভোটও রামে

বামফ্রন্টের প্রার্থী মিলি ওঁরাও এর দাবি ছিল তিনি জিতলে বন্ধ বাগান খোলা, চা শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি, ৬০০০ হাজার টাকা পেনশন, স্বাস্থ্য এবং শিক্ষার দাবি লোকসভায় তুলবেন। মিলির কাছেও চা শ্রমিকেরা প্রশ্ন তুলেছে বাম জমানার ৩৪ বছরেও চা শ্রমিকদের দুর্দশা কেন ঘোচেনি। জবাবে বামফ্রন্টের নেতারা বলেছেন বাম জমানায় সব চা বাগানে বিদ্যুৎ গেছে। তখন ছ মাস অন্তর রাজ্য সরকার বাগানের মালিক এবং শ্রমিকদের সঙ্গে বৈঠক করত। ফলে রেশন চালু রাখা, হাসপাতাল এবং স্কুলের পরিকাঠামোর উন্নতি ইত্যাদি দায়িত্ব এড়াতে পারতেন না মালিকেরা। তাছাড়া তখন তিন বছর অন্তর প্রায় ৪০ শতাংশ মজুরি বৃদ্ধি হত শ্রমিকদের। চুক্তির ভিত্তিতে স্থির হওয়া ন্যূনতম মজুরির টাকা নিয়মিত পেতেন শ্রমিকেরা। কিন্তু এসব পুরনো বস্তাপচা কথা শুনতে চায় নি বাগিচা শ্রমিকেরা। আলিপুরদুয়ারের কংগ্রেস প্রার্থী পেশায় স্কুলশিক্ষক মোহনলাল বসুমাতার প্রচারেও উঠে এসেছে চা শ্রমিকদের সংকট। তবে কংগ্রেসের আলিপুরদুয়ার জেলা সভাপতি বিশ্বরঞ্জন সরকার মারা যাওয়ার ফলে সেখানে দলের সংগঠন ছিল কিঞ্চিৎ নড়বড়ে। নতুন জেলা সভাপতি গজেন্দ্রনাথ বর্মনের নেতৃত্বে শিক্ষক সংগঠনের সঙ্গীদেরকে নিয়ে লড়ে গেছেন তিনি। কিন্তু ফল তুলে আনতে পারেন নি। তাই বাগিচা শ্রমিকেরা ভরসা রেখেছেন একদিকে আদিবাসী এবং অন্যদিকে বিমল গুরুং এর ডুয়ার্সের অন্যতম সহচর জন বারলার ওপর। ধ্বস নেমেছে বাম কংগ্রেসের নিজস্ব ভোটব্যাঙ্কে। আদিবাসী-নেপালী কম্বিনেশনকে হিসাব কষেই কাজে লাগিয়েছেন অমিত শাহ মুকুল রায়রা।

বাগিচাকে ঘিরে আশা-নিরাশার দোলাচল

এবারের লোকসভা নির্বাচনে মূল প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন তৃণমূলের বিদায়ী সাংসদ দশরথ তিরকে, কংগ্রেসের মোহনলাল বসুমাতা, আরএসপির মিলি ওঁরাও এবং বিজেপির জন বারলা। আলিপুরদুয়ার কেন্দ্রের বিদায়ী তৃণমূল সাংসদ এবং এবারের একই দলের প্রার্থী দশরথ তিরকের দাবি ছিল তৃণমূল সরকারের আমলে কয়েকটা বন্ধ চা বাগান খুলেছে এবং চা শ্রমিকদের দৈনিক মজুরি ৬৭ টাকা থেকে বেড়ে ১৭৬ টাকা হয়েছে। কালচিনিতে যখন তাঁর সঙ্গে কথা বলেছিলাম, তিনি বলেছিলেন চা শ্রমিকরা জানেন তৃণমূলই চা শ্রমিকদের বন্ধু। তাই তাঁর আশা ছিল তিনি লক্ষাধিক ভোটে জিতবেন। ২০১৪ সালের লোকসভা ভোটে তিনি জিতেছিলেন ২১ হাজার ৩৯৭ ভোটে। অন্যদিকে আলিপুরদুয়ারের বিজেপি প্রার্থী জন বারলার প্রতি চা শ্রমিকদের প্রশ্ন ছিল ২০১৬ সালের বিধানসভা ভোটের আগে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী উত্তরবঙ্গের জনসভায় ডানকানসের সাতটি বাগান অধিগ্রহণ করার যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তা এখনও

আলিপুরদুয়ার লোকসভা কেন্দ্রে ৬২টা চা-বাগান। তার মধ্যে ১১টা বন্ধ। যেগুলি খোলা সেগুলোতেও শ্রমিকেরা ন্যূনতম মজুরি এবং চিকিৎসার সুযোগ থেকে বঞ্চিত। শ্রমিক সন্তানেরা স্থানীয় সরকারি স্কুলগুলোতে ভর্তি হয়। কিন্তু সেসব স্কুলের পরিকাঠামো ভাল না থাকার ফলে পড়াশোনা বেশিদূর এগোয় না। অনেক শ্রমিক মা বাবা কষ্ট করে বেসরকারি স্কুলে সন্তানকে ভর্তি করেন। কিন্তু তার খরচ অত্যন্ত বেশি বলে বেশিদিন টানতে পারেন না। তাই স্কুলছুট বাড়ে। অথচ দেশের চা-বাগান সংক্রান্ত আইন অনুযায়ী স্বাস্থ্য, রেশন, শিক্ষা, চিকিৎসা এসব কিছুই চা-শ্রমিকদের প্রাপ্য। তাই যে লোকসভার একটা বড় অংশ বিপন্ন চা-শ্রমিক, তার মন বিষণ্ন হওয়াই স্বাভাবিক ঘটনা।

পূরণ হল না কেন। চা বাগানে ন্যূনতম মজুরি দৈনিক ৩৫০ টাকা করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে প্রায় তিন বছর আগে পড়শী রাজ্য অসমে সরকারে এসেছিল বিজেপি। সেখানেও সেই প্রতিশ্রুতি এখনও বাস্তবায়িত করা হয়নি কেন সেই প্রশ্ন তুলেছিলেন চা শ্রমিকেরা। এর জবাবে জন বারলা বলেছিলেন, রাজ্য সরকার আদালতে গিয়ে অসহযোগিতার পথ নিয়েছিল বলে ডানকানসের বাগানগুলি কেন্দ্র অধিগ্রহণ করতে পারেনি। আসামের বাগিচায় ন্যূনতম মজুরির প্রশ্নে তাঁর বক্তব্য ছিল যেহেতু বিজেপির নতুন সরকার আসামে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তাকে একটু সময় দিতে হবে এবং নিশ্চয়ই তারা চা শ্রমিকদের আশা পূরণ করতে পারবে। তাই আশা-নিরাশার দোলাচলে বিভক্ত ছিল আলিপুরদুয়ার কেন্দ্রের চা বাগিচা শ্রমিকদের মন এবং মানসিকতা।

ট্রেড ইউনিয়ন এবং নেতাদের বিরুদ্ধে অনাস্থা

ইউনিয়ন তো প্রতিবারই ভোটের মুখে অনেক কিছুই বলে। কিন্তু কিছু হয় কি? এত খাটাখাটনির পরেও মালিকদের বা "মানিজার বাবুদের" অকথ্য গালাগালি জোটে। এক নিশ্বাসে কথাগুলো বলে গেলেন জয়পুর চা বাগানের চা শ্রমিক রিনা মুন্ডা। চোখেমুখে রাগ। চুম্বকে এটাই চা শ্রমিকদের মূল বক্তব্য। ঠিক নির্বাচনের প্রাক্কালে ডানকানস গ্রুপের একটি ছাড়া বাকি সবকটি চা বাগান খুলে গিয়েছিল এবং আরও তিনটি বাগান খোলার প্রক্রিয়া চলছিল। তাই স্বাভাবিকভাবেই ঠিক নির্বাচনের প্রাক্কালে চা বাগিচাগুলো খুলে দেওয়ার পেছনে কোনও নেপথ্য নাটক কাজ করছে এটাও প্রশ্ন উঠেছিল। এটাও প্রশ্ন ওঠে যে এইসব বাগানগুলি তাহলে আগে খুলল না কেন? তাহলে কি কেবলমাত্র ভোট ব্যাংক সুরক্ষিত রাখার প্রশ্নেই বাগান খোলে, আবার বাগান বন্ধ হয়? প্রশ্ন ওঠে তৃণমূল ট্রেড ইউনিয়ন নেতাদের ঘিরে। পাশাপাশিভাবে প্রশ্ন উঠতে শুরু করে শাসকদলের কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃত্বের সঙ্গে মালিকপক্ষের বোঝাপড়া নিয়েও। আসলে আলিপুরদুয়ার এবং জলপাইগুড়ি লোকসভা কেন্দ্রের ভোটে নির্ণায়ক ভূমিকা নিয়েছে চা-বলয়ের ভোট। কারণ মোট ভোটারের ৭৫ শতাংশই চা-বলয়ের মধ্যে পড়ে। শ্রমিকদের দাবিদাওয়ার জন্য লড়াই করার সংগঠন কম নেই, তবুও যেন সমস্যাটা একপ্রকার চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে যার নির্যাস শ্রমিক সংগঠনগুলির ওপর আস্থা চলে যাচ্ছে চা শ্রমিকদের।

কাজের খোঁজে অন্য রাজ্যে

কর্মসংস্থানের সুযোগ না থাকার ফলে চা শ্রমিকদের ছেলেমেয়েরা কাজের খোঁজে অন্য রাজ্যে পাড়ি দিতে বাধ্য হচ্ছে। বাড়ছে নারী পাচার। দারিদ্র্যের সুযোগ নিয়ে একদল নারী পাচারকারী রমরমিয়ে ব্যবসা ফেঁদেছে চা বাগান সংলগ্ন এলাকাগুলিতে। চা শ্রমিকদের মেয়েদেরকে পাচার করে দেওয়া হচ্ছে। ডামডিম চা বাগানের শ্রমিক নির্মলা ঠাকুরের কথায়, "বছরে ছয় মাস কাজ জোটে। ওই সময়টাতেই যেটুকু আয় হয়। তাও আবার সামান্য মজুরি যা দিয়ে সংসার টানা যায় না। বাকি সময় যে কষ্ট সেটা আমরাই জানি। আমাদের বাড়ি নেই, ছেলেমেয়েদের পড়াতে পারছি না।" জলপাইগুড়ি কেন্দ্রের চা বলয়ে আদিবাসী বিকাশ পরিষদ, গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা, সিটুর চা বাগান মজদুর ইউনিয়ন, আইএনটিইউসি অনুমোদিত ন্যাশনাল ইউনিয়ন অফ প্ল্যান্টেশন ওয়ার্কার্স, তৃণমূল কংগ্রেসের তরাই ডুয়ার্স প্ল্যান্টেশন ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের শাখা রয়েছে বিভিন্ন বাগানে। চা শ্রমিক অমৃতা কুজুরের মতে, "কোন ইউনিয়ন আমাদের দাবি মেটাবে জানি না। সবাই বলে আমাদেরকে ভোট দাও। তোমাদের মজুরি বাড়বে। কিন্তু মজুরি বাড়ে না। মালিকরা যখন তখন গালিগালাজ করে। মজুরি চাইতে গেলে বলে কাজ করতে হবে না"। বস্তুত ইউনিয়ন আছে, লড়াই করে বাঁচতে চাই স্লোগানও আছে। শুধু চা শ্রমিকেরাই ভাল নেই।

এন আর সি ইস্যু

লাগোয়া রাজ্য অসমে বিজেপির তুরুপের তাস জাতীয় নাগরিকপঞ্জী হবার ফলে সেখানকার অনেক মানুষ ভিটেমাটি ছেড়ে চলে আসেন আলিপুরদুয়ারে। এনআরসি ইস্যুর সেই উদ্বেগ এবং আতঙ্ক সংকোশ নদী পেরিয়ে পৌঁছে গিয়েছিল বাংলাতেও। উত্তরবঙ্গে এসে অমিত শাহ যখন হুংকার দিয়েছিলেন এনআরসি ইস্যুতে তখন আতঙ্ক আরও বেড়ে গিয়েছিল। যেহেতু মমতা ব্যানার্জি দ্বিধাহীনভাবে এনআরসি-র বিরুদ্ধে লড়ে যাচ্ছিলেন তাই আশা করা গিয়েছিল সেই ভূমিকা তৃণমূলকে বাড়তি সুবিধা এনে দেবে এবং ঠিক ততটাই পিছিয়ে রাখবে

বিজেপিকে। কিন্তু এই ধারণা ছিল ভুল। এই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাদের জন্য দরজা খোলা রাখার বার্তা দেওয়ার ফলে অসন্তুষ্ট আলিপুরদুয়ার কেন্দ্রের ভোটারেরা এবারের লোকসভা ভোটে এই বিষয়েও তাদের অসন্তোষ প্রকাশ করেছে বলে অনুমান রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের।

শাসক দলের আত্মঅহমিকা

জন বারলা প্রার্থী ঘোষিত হবার পর দেখা গিয়েছিল খোদ আদিবাসী সমাজে তাকে নিয়ে ছিল চূড়ান্ত বিক্ষোভ। পঞ্চায়েত নির্বাচনে কৌশলগতভাবে বিজেপির পাশে ছিল ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চা। কিন্তু লোকসভা নির্বাচনে তারাও সরে দাঁড়িয়েছিল। আদিবাসীদের আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ সংগঠন অখিল ভারতীয় আদিবাসী বিকাশ পরিষদ সাফ জানিয়ে দিয়েছিল গদ্দার জন বারলা বিমল গুরুংয়ের প্রার্থী। বিমল গুরুং এর জনপ্রিয়তার পরিমাপ তৃণমূল নেতারা করে উঠতে পারেন নি। বিধানসভায় মাদারিহাটে জিতেছিল ভারতীয় জনতা পার্টি। সেখানকার বিজেপির ভোটব্যাংকেও ধ্বস নেমেছে বলে একটা ভ্রান্ত ধারণা ছিল তৃণমূলের স্থানীয় নেতাদের। এর সঙ্গে বিমল গুরুং শিবিরে ভাঙ্গন দেখা দেবার ফলে অনেকটাই নিশ্চিন্তে ছিল তৃণমূল কংগ্রেস এবং সেই জন্যই সাংগঠনিক শিথিলতার অভিযোগ উঠেছিল যার মাশুল দিতে হয়েছে দলকে। তৃণমূল বিরোধীরা অবশ্য মাঝে মাঝেই বলতেন চোরাস্রোত বইছে। কিন্তু দাম্ভিক মোহন শর্মা বলতেন, আমার জন্ম ডুয়ার্সের চা বলয়ে, চোরাস্রোত সামলে পাহাড়ি নদী কীভাবে পার হতে হয় তা আমি ভাল করেই জানি। তাহলে এখন কী করবেন মোহনবাবু?

প্রতিষ্ঠান বিরোধিতার ভোট

দশরথ তিরকের হয়ে রোজ বিভিন্ন এলাকায় প্রচার চালিয়েছিলেন রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ নেতামন্ত্রীরা। সারা জেলায় চষে বেরিয়েছিলেন মোহন শর্মা এবং সৌরভ চক্রবর্তীরা। কিন্তু তাদের জনভিত্তি এবং গ্রহণযোগ্যতা যে দিনে দিনে দুর্বল হয়ে যাচ্ছে সেই দিকে তাদের কোনও হুঁশ ছিল না। প্রশাসনিক ক্ষমতার বলে একদিকে জেলার সর্বোচ্চ নেতা থেকে শুরু করে চুনোপুটি নেতাদের দাম্ভিকতা, আচরণগত ত্রুটি এবং অর্থনৈতিক বিভিন্ন ধরনের অনৈতিকতা যে মানুষের নজরে এসেছে সে বিষয়ে তারা হয় বুঝতে পারেন নি অথবা বুঝেও না বোঝার ভান করে ছিলেন। প্রার্থী ঘোষণার অনেক আগে থেকেই প্রচার শুরু করে দিতে পেরেছিল তৃণমূল কংগ্রেস। প্রার্থীও যেহেতু অচেনা ছিলেন না এবং সাংসদ হওয়ার আগেও যেহেতু টানা তিনবারের বিধায়ক ছিলেন দশরথ তিরকি এবং বাম জমানায় পূর্ত দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রীও ছিলেন দু'বার, তাই প্রতিষ্ঠানবিরোধিতার ভোট যে ধীরে ধীরে গ্রাস করছে তাকে কেন্দ্র করে সেটা তিনিও টের পান নি সম্ভবত।

পঞ্চায়েত নির্বাচনের স্মৃতি

গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে ভোট দিতে না পারার স্মৃতিও ভাবিয়েছে কিছু মানুষকে। সাংগঠনিকভাবে তৃণমূল কংগ্রেস বাকিদের চেয়ে অনেক এগিয়ে থেকেই ভোট ঘোষণার পর বিভিন্ন ব্লকে এবং প্রত্যন্ত এলাকায় কর্মীসভা, ছোট ছোট পাড়া বৈঠক এবং বিভিন্ন এলাকায় লম্বা মিছিল করলেও চাওয়া না পাওয়ার অপ্রাপ্তি থেকে সেই মিছিলের মন-মানসিকতা কখন যে পরিবর্তিত হতে শুরু করেছিল সেটা জনবিচ্ছিন্ন নেতারা টের পাননি

ডামডিম চা বাগানের শ্রমিক নির্মলা ঠাকুরের কথায়, ''বছরে ছয় মাস কাজ জোটে। ওই সময়টাতেই যেটুকু আয় হয়। তাও আবার সামান্য মজুরি যা দিয়ে সংসার টানা যায় না। বাকি সময় যে কষ্ট সেটা আমরাই জানি। আমাদের বাড়ি নেই, ছেলেমেয়েদের পড়াতে পারছি না।'' চা শ্রমিক অমৃতা কুজুরের মতে, ''কোন ইউনিয়ন আমাদের দাবি মেটাবে জানি না। সবাই বলে আমাদেরকে ভোট দাও। তোমাদের মজুরি বাড়বে। কিন্তু মজুরি বাড়ে না। মালিকরা যখন তখন গালিগালাজ করে। মজুরি চাইতে গেলে বলে কাজ করতে হবে না''।

এই জন্যই যে পঞ্চায়েত নির্বাচনে যদি মানুষ ভোট দিতে পারতো তাহলে সংগঠন কোন অবস্থায় আছে সেটা তাদের পক্ষে বোঝা সম্ভব হত। কিন্তু পঞ্চায়েত নির্বাচনের ভোটলুট প্রচেষ্টা এবং যেনতেন প্রকারেণ পঞ্চায়েত দখল করার প্রতিযোগিতা মোহন শর্মা এবং সৌরভ চক্রবর্তীর কাছে বুমেরাং হয়ে ফিরে এসেছে। এইসব ভাবনার প্রতিফলন ঘটেছে ১১ই এপ্রিলের লোকসভা নির্বাচনের ইভিএমে।

চা শিল্প সংশ্লিষ্ট ভুল সরকারী নীতির প্রভাব

১) চা শ্রমিকেরা অভিজ্ঞতার নিরিখে প্রশ্ন তুলেছেন রাজ্যের তৃণমূল সরকার তাদের রেশন বন্ধের ব্যবস্থা করল কেন? মজুরি আইন মাফিক আগে তারা ৪০ পয়সা কেজি দরে মাসে ৪৫ কেজি চাল এবং গম বাগান মালিকদের কাছ থেকে রেশন হিসাবে পেত। রাজ্য সরকার ২ টাকা কেজি দরে চাল দেওয়া শুরু করার পরে নির্দেশিকা জারি করে জানায় এই রেশনের আর প্রয়োজন নেই। কেন মালিকদের এই সুবিধা দেওয়া হল? রেশনটাও তো থাকতে পারতো আগের নিয়মের মত। এর ফলে গত তিন বছরে ১৩৮ টাকা, ১৫০ টাকা অথবা ১৭৬ টাকা দিন মজুরির চা শ্রমিকদের সংসারে অনটন আরও বেড়েছে বলে অভিযোগ। ১৯৭৮ সালে বামফ্রন্ট সরকার ওয়েস্ট বেঙ্গল ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন তৈরি করে যাদের কাজ ছিল বন্ধ চা বাগান অধিগ্রহণ করা। ২০১৫ সালে সেই কর্পোরেশন বিক্রি করে দেওয়া হল কেন ভোটপর্ব সমাপনের পর সেই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে চা বলয়ে। আর ট্রেড ইউনিয়ন নেতাদের ওপর ক্রমেই আস্থা হারিয়ে ফেলে শ্রমিকেরা সম্প্রদায় এবং জাতপাতের রাজনীতিকেই বেছে নিয়েছে একথা অস্বীকার করা যায় না।

২) আলিপুরদুয়ারের আরও একটা সমস্যা আছে। এর সীমান্তে ভুটানের অরণ্য ধ্বংস করে ডলোমাইট এবং অন্যান্য পাথর তুলে বাংলাদেশে চোরাচালান করা হয়। ফলে ভুটান পাহাড় লাগোয়া চা-বাগান এলাকায় সাম্প্রতিক কালে আবহাওয়ার ক্ষেত্রে একটা আমূল পরিবর্তন হয়ে গেছে। সামান্য বৃষ্টিতেই এখন সেখানে বন্যা হয়। পোকামাকড়ের উৎপাত বাড়ার ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে চা-বাগিচাগুলি। শ্রমিকদের ইদানিং খুব চর্মরোগ হচ্ছে। অল ইন্ডিয়া প্ল্যান্টেশন ওয়ার্কার্স ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক জিয়াউল আলমের কাছ থেকে জানতে পারলাম শ্রমিকেরা এখানকার চা বাগান ছেড়ে কেরল, কর্ণাটক এবং তামিলনাড়ুর চা এবং কফি বাগানে চলে যাচ্ছে। কারণ কেরলে দৈনিক ন্যূনতম মজুরি ৫২৭ টাকা এবং কর্ণাটক ও তামিলনাড়ুতে ৩৫০ টাকার আশেপাশে। তাই বলা যায় ভোট আসবে, ভোট যাবে। আর বিরোধ নয়। সবকা সাথ, সবকা বিকাশ শুনতে যত ভাল বাস্তবে তা মেনে চলা খুবই কঠিন। এর জন্য প্রয়োজন আমরা ওরা এই ধারণা থেকে বের হয়ে আসা। শুভবুদ্ধির উদয় হোক। চা বাগিচার শ্রমিকেরা ন্যূনতম মজুরি পেতে শুরু করুক। বন্ধ কারখানাগুলিতে আবার শুরু হোক দৈনন্দিন ব্যস্ততা। হাসি ফুটুক হতদরিদ্র বাগিচা বলয়ে।

নির্বাচন রাজনীতির পাচন

নির্বাচনে নাকি ব্রেন হ্যাকিং !

প্রদোষ রঞ্জন সাহা

বাংলায় নির্বুদ্ধিজীবি রাজনৈতিক মহলে একটা কথা ইতিমধ্যেই বেশ চালু হয়েছে— ‘ব্রেন হ্যাকিং’। এ এক সাঙ্ঘাতিক শব্দ, শুনলেই কেমন পেটের মধ্যে গুড় গুড় করতে থাকে। এমনিতেই বুকজ্বালা অম্বল গ্যাস বা আমাশার জ্বালায় জেরবার বছরভর, তার ওপর এই শব্দব্রহ্ম তাল পাকিয়ে দেয় ঘিলু। এ এক অজানা অদৃশ্য দৈত্যের কারসাজি, যে আমাদের মন পড়ে নিতে পারে, তারপর তার বিবশ দাসানুদাস হয়ে যায় আমাদের মন। সে দৈত্য আমাদের ইচ্ছেয় বা অনিচ্ছেয় ইষ্ট বা অনিষ্ট করতে পারে! এবারের নির্বাচনী মরশুমের শেষ প্রান্তে এসে বঙ্গীয় মেধাবীকুল অনুধাবন করেছেন, সামথিং মাস্ট বি রং! সব কিছুর পেছনে নিশ্চয়ই অন্য কোনও ‘অপদেবতা’ কাজ করছে। নিজেদের অভিজ্ঞতার হিসেব মিলছে না কিছুতেই। প্রতিপক্ষ মঞ্চে হাসিঠাট্টা করছে ঠান্ডা মাথায়, রাগিয়ে দিচ্ছে অবহেলায়। জনমানসে ভিলেন থেকে হিরো হয়ে উঠছে অবলীলায়। এই নয়া অবাক রাক্ষসের নাম কী?

পোশাকি নাম আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স। ভার্চুয়াল রিয়ালিটিতে নতুন শতাব্দীর উপহার এই প্রযুক্তি-মেধা। মোবাইলে আপনার সারাদিনের নানান সাইটে চলাফেরা থেকে, আপনার সোশ্যাল মিডিয়ায় লাইক বা পোস্ট থেকে, আপনার ঠিকুজি কুষ্ঠী থেকে আপনার পছন্দ অপছন্দের হদিশ পেতে পারে, আপনার কামনা বাসনাকে কন্ট্রোল করতে পারে। গোড়ায় ব্যবসা-বাণিজ্যের মার্কেট বুঝতে আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স ছিল ভীষণ কার্যকরী, বলাই বাহুল্য। কিন্তু অচিরেই বণিকের জাদুদন্ড পরিণত হল রাজদন্ডে। বছর পাঁচ আগেই নির্বাচনী লড়াইতে ব্যবহার শুরু হয়েছিল এই প্রযুক্তি-মেধার। পাঁচ বছরে তার ব্যবহার বেড়েছে বহুগুণে। মোবাইলকে জলের দামে প্রত্যন্ততম কোণের দরিদ্র মানুষের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে যখন, তখনই হয়ত সংকেত পেয়েছেন

আর্টিফিসিয়াল

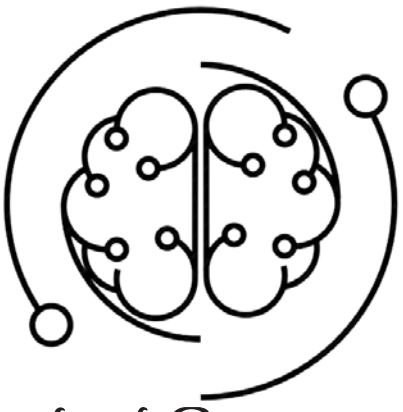

ইন্টেলিজেন্স

কিরিটি-ব্যোমকেশ-ফেলুদা-রা। কিন্তু তাঁরা তখন ব্যস্ত ছিলেন গুপ্তধনের রহস্য উদঘাটনে কিংবা কোনও পেটি খুনের কেসে। বাংলায় আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স থেকে গিয়েছে কিশোর কল্পবিজ্ঞান কাহিনিতে।

আমরা বিশেষ গুরুত্ব না দিলেও সবারই জানা, ২০১৪-র বিহার নির্বাচনে নীতীশ কুমারের জয়ে কতখানি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল পোল স্ট্রাটেজিস্ট প্রশান্ত কুমারের ডেটা অ্যানালিসিস বা হিমাচলে আস্তিক সিনহার ডিজিটাল ক্যাম্পেইন। কোনও এলাকার মানুষের আচরণ অভ্যেস কথাবার্তা ধরে নিয়ে তাকে প্রযুক্তি-মেধায় বিশ্লেষণ করে সেই অনুযায়ী ক্রমাগত ফেসবুক টুইটার হোয়াটস্যাপে প্রচার চালিয়ে সফল হন তাঁরা। বিশেষজ্ঞরা বলেন, আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স, অ্যালগরিদম ও বিশ্লেষণমূলক তথ্য একটি রাজনৈতিক দলকে বলে দিতে পারে একটি নির্দিষ্ট জনসংখ্যার আচরণ প্যাটার্ন, সেই জনমতকে প্রভাবিত করা সম্ভব দীর্ঘমেয়াদী ডিজিটাল মাধ্যমে প্রচারের নিপুণতায়। এই প্রযুক্তির একটিই ফর্মুলা, যত বেশি মানুষকে অনলাইনে আনা যায় ততই আন্তর্জালের ফাঁসে আটকানো ভোটের পরিমাণ বাড়ানো সম্ভব।

গত পাঁচ বছরে দেশের ছোটবড় রাজনৈতিক দলগুলি এই অবাক প্রযুক্তির সহায়তা নিয়েছে স্থানীয় ও বাইরের এজেন্সির কাছে। তৈরি করেছে নিজেদের ডিজিটাল টিম। প্রাপ্ত ডেটা বিশ্লেষণ করে সেই টিম তৈরি করেছে সত্য অর্ধসত্য অসত্য ভিডিও, ক্রমাগত জনপ্রিয় হোয়াটসঅ্যাপ ফেসবুকে ছড়িয়ে দিয়েছে তার টার্গেট অডিয়েন্সের কাছে। বিজ্ঞাপনের আধুনিক প্রযুক্তি কাজে লাগিয়েছে ভোটপ্রচারে। বাজেটের এক বিশাল অংশ খরচ হয়েছে ডিজিটাল মিডিয়ায়। প্রত্যেকটি দল এলাকা ধরে ধরে জেনে নিয়েছে ভোটারের চালচলন, মানসিকতা। মোবাইল যেমন ডিকোড করেছে মানুষের ক্ষোভ আশা ভরসার কথা, তেমনই মোবাইলের মাধ্যমে মানুষের মতামতকে দলের প্রয়োজন অনুযায়ী ভেঙ্গে দিয়েছে কিংবা শক্তিশালী করেছে এই টিম।

সব দল এই নয়া প্রযুক্তির ব্যবহার করলেও, এখানেও রণনীতির সেরা কৌশলই কিস্তিমাত করেছে। বলাই বাহুল্য, আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স ও ডিজিটাল মিডিয়ার ওস্তাদিতে বাকিদের টেক্কা দিয়েছে ভারতীয় জনতা পার্টি। বিশেষজ্ঞদের কাছেই জানা যায়, এবার দেশের এক একটি অংশে গড়ে ২৫০০০ হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ তৈরি করেছিল বিজেপি। গত কয়েক বছর ধরেই দোরে দোরে না গিয়ে মানুষের ঘরে ঘরে হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজের মাধ্যমে পৌঁছে গিয়েছিল, ঠিক যে ধরনের

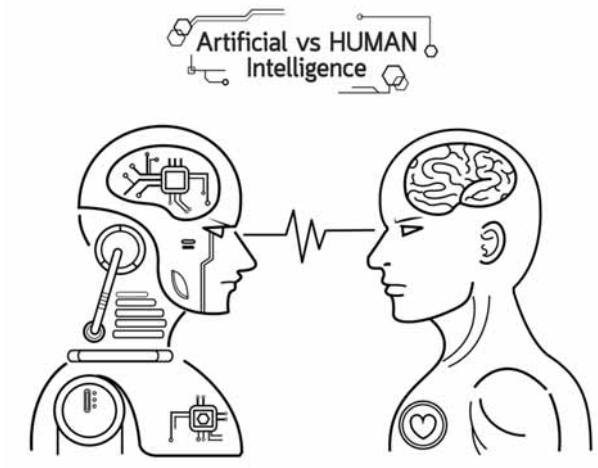

ছবি-স্লোগান-ভিডিও সেখানকার মানুষ পছন্দ করবে বা বিশ্বাস করবে। যেমন পুলুয়ামা-বালাকোটের পর জাতীয়তাবোধের উগ্র চেতনায় ভরে গিয়েছিল সমগ্র দেশ, পাকিস্তান বিরোধী মারাত্মক সব ভিডিও ভাইরাল হয়েছে নিমেষে, সেগুলির সত্যাসত্য বিচার করবার মত কেউ নেই জেনে, মানুষকে বিশ্বাস করিয়ে ছেড়েছে, একমাত্র মোদি সরকারই দেশকে রক্ষা করতে পারে। এবারের নির্বাচনে এই আচমকা কৌশলে বাকিরা যে কুপোকাত হয়েছে তা আর নিশ্চয়ই আলাদা করে বলে দিতে হয় না।

কেবলমাত্র জাতীয়তাবোধের ঝড়ের ভরসায় থাকেন নি মোদিরা, তার আগে নিঃশব্দে উজ্জ্বলা যোজনার মত কেন্দ্রীয় প্রকল্পের নানা সুবিধাকে বিশ্বাসযোগ্য দক্ষতায় সমাজের দরিদ্র নীচুতলার মানুষের হাতের মোবাইলে সিনেমার মত ছড়িয়েছেন। একই আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স ডেটা অ্যানালিসিস ও ডিজিটাল মিডিয়াতে ব্যবহার করেছে বিরোধী শিবিরের কংগ্রেস, বাম দল, আম আদমি পার্টি, সমাজবাদী পার্টি ইত্যাদিরাও। কিন্তু কংগ্রেসের ডিজিটাল কৌশল সীমাবদ্ধ থেকে গিয়েছে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত রুচিতে, নেমে আসতে পারে নি কর্পোরেট থেকে গ্রামের চৌরাহায়। মোদীকে মোক্ষম চাপে রাখলেও শেষ পর্যন্ত দুর্নীতিগ্রস্ত প্রমাণ করে উঠতে পারে নি। বেকারত্ব নিয়ে বাকিদের ডিজিটাল প্রচার মধ্যবিত্তের চেতনায় কিঞ্চিৎ প্রশ্ন তুললেও তা হারিয়ে গিয়েছে বিজেপি-র শক্তিশালী ধর্মীয় ও জাতীয়তাবাদের ক্রমাগত ন্যারেটিভে।

অনুমান করতে অসুবিধা হয় না, বাংলায় মহানেত্রী এই আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্সের চাইতে অনেক বেশি ভরসা করেছিলেন নিজেদের মেশিনারি, থিঙ্কট্যাঙ্ক ও আত্মবিশ্বাসের ওপর। ডেটা অ্যানালিসিসের চাইতে বেশি প্রত্যয় রেখেছিলেন দলের ব্লক ও জেলা স্তরের নেতাদের কথার ওপর, যাদের গত গ্রামীণ ভোটে জনাদেশ নেওয়ার সাহসই হয় নি আদৌ। ফলে তাঁদের ডিজিটাল মিডিয়ায় প্রচার মানুষের মন বুঝে হয় নি, মানুষের মন ঘোরাতে দৃশ্যতই ব্যর্থ হয়েছে সে প্রচার, মোদিদের আগ্রাসী প্রযুক্তিসহ লড়াইয়ের কাছে পর্যুদস্ত হতে হয়েছে। কোনও সংগঠন ছাড়াই অর্ধেক বাংলা জয় করে নিয়েছে পদ্মফুল! বাকিটা দিদির অবিন্যস্ত বাহিনীর হাতে!

যেহেতু যুদ্ধক্ষেত্রে কোনও নীতিই আর অন্যায় বলে মানা হয় না, তার ফলে নির্বাচনের সময় কাতারে কাতারে ফেক নিউজ, মিম, ট্রোলের মহাপ্লাবনে নিমজ্জিত ছিল মানুষ, প্রকৃত সংবাদ তার মনে কোনও আলোড়ন ঘটাতে পারে নি। এবার প্রায় সব দলকেই এই দায়ে

অভিযুক্ত করতে পারে সাধারণ মানুষ। কিন্তু লাভ নেই তাতে, যা ঘটবার তা ঘটে গিয়েছে, লড়াইয়ে জেতা নির্বাচিত প্রতিনিধি পাঁচ বছরের জন্য পৌঁছে গিয়েছে সংসদে। ডিজিটাল মিডিয়ার ঝড়ে প্রিন্ট মিডিয়া এবার বঙ্গদেশে কার্যত শিক্ষিত মানুষের অঢেল সময়ে ভাগ বসাতে পারে নি। ২০১৬-র বিধানসভা ভোটের পর বাংলার প্রিন্ট মিডিয়া আরও একবার শত বিরোধিতা সত্ত্বেও জনমত নির্মাণে কার্যকরী ভূমিকা নিতে পারল না। উল্টে ভিডিও-র 'সত্যাসত্য যাচাই করা হয় নি' বলে প্রচার করে গিয়েছে নানা ভাইরাল ভিডিও-র খবর, প্রকারান্তরে স্বীকার করে নিয়েছে আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স ও ডিজিটাল মিডিয়ার প্রভুত্বকে।

তবু ভরসা হারাবার কথা নয় হিউম্যান ইন্টেলিজেন্সে, যতক্ষণ সেই দাদা বা দিদির বুদ্ধি রুখে দিতে পারে এই আগ্রাসনকে ততক্ষণ তো নয়ই। এটা

কোনও এলাকার মানুষের আচরণ অভ্যেস কথাবার্তা ধরে নিয়ে তাকে প্রযুক্তি-মেধায় বিশ্লেষণ করে সেই অনুযায়ী ক্রমাগত ফেসবুক টুইটার হোয়াটস্যাপে প্রচার চালিয়ে সফল হন তাঁরা। বিশেষজ্ঞরা বলেন, আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স, অ্যালগরিদম ও বিশ্লেষণমূলক তথ্য একটি রাজনৈতিক দলকে বলে দিতে পারে একটি নির্দিষ্ট জনসংখ্যার আচরণ প্যাটার্ন, সেই জনমতকে প্রভাবিত করা সম্ভব দীর্ঘমেয়াদী ডিজিটাল মাধ্যমে প্রচারের নিপুণতায়। এই প্রযুক্তির একটিই ফর্মুলা, যত বেশি মানুষকে অনলাইনে আনা যায় ততই আন্তর্জালের ফাঁসে আটকানো ভোটের পরিমাণ বাড়ানো সম্ভব।

ঠিক, আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্সের উপর ভরসা করে হয়ত যুদ্ধে জেতা যায় না, কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বীর দুর্বলতা খুঁজে বের করে তাকে হারিয়ে দেওয়া সম্ভব অক্লেশে। এবারের নির্বাচনে এই প্রযুক্তি-মেধার ব্যবহার গত নির্বাচনের তুলনায় কতগুণ বেশি হল তার তথ্য দিতে পারবেন ডেটা অ্যানালিস্টরাই, আরও কিছুদিন লাগবে তাঁদের সে গবেষণায়। ততক্ষণ আমরা বুঝে নিতে পারি, এই দানবীয় শক্তিকে পরমাণু শক্তির মতই ব্যবহার করা যায় বোমা নির্মাণে কিংবা মানবসম্পদের উন্নতিতে। মানুষের অভিমত পাঁচ বছর ধরে কতটা পাল্টায় তার খোঁজ রাখে এই মেধা। মানুষের আজ আর লুকোবার মত কোনও নিজস্বতা কিছু নেই, চেতনা ক্রমশ লুপ্ত হয়ে আসছে। ডিজিটাল মিডিয়া আজ দাঙ্গার আগুন জ্বালাবার ক্ষমতা রাখে, হিরোকে জিরো করবার পাওয়ার ধরে। এখানেও তাই ছাপোষা মানুষের ভয় একটাই, রাজনীতির লোকেদের হাতে যখন পড়েছে এই জব্বর প্রযুক্তি, ক্ষমতায় থাকতে কিংবা ক্ষমতায় ফিরতে এর ক্রমাগত অপপ্রয়োগ সভ্যতা ধ্বংসের অন্যতম কারণ না হয়ে দাঁড়ায়!

আগামী সংখ্যা থেকে শুরু হচ্ছে রহস্য নভেলা

মরা মৌমাছির চোখ

নিঃসীম অন্ধকারে ডুবে থাকা মানুষ রাতের ঘুমিয়ে পড়া জগতে একা জেগে থাকে। কার জন্য অপেক্ষা করে তার চিতা-দগ্ধ দেহ! নীলম কি জানে সেই রহস্য? কে আড়ি পাতে সুবর্ণার ঘরের বাইরে? কেন জবালার চোখের দিকে তাকিয়ে নীলমের মনে হয় এই চোখ জীবিতের নয়।এ এক মরা মৌমাছির চোখ! একটি অশুভ হাত এগিয়ে আসে ছায়াচ্ছন্ন অন্ধকারে শুভব্রতর দিকে। সাক্ষী থাকে পিশাচ।

শুরু হচ্ছে সাগরিকা রায়-এর
রহস্য নভেলা
মরা মৌমাছির চোখ

এখন ডুয়ার্স

বউ সাথে পথে পথে

ছবি- প্রদীপ্ত চক্রবর্তী

গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য

এখনও ঘুরে বেড়াই। কখনও একা কখনও দোকা। ডাক্তারবাবু, সবজান্তা পাগলাদাশু বলে, 'তোমাকে কি সুখে থাকতে ভূতে কিলোচ্ছে? সুস্থ শরীরটাকে দুরমুশ করার কোনও মানে হয়। শরীরের নাটবল্টুগুলিকে গ্রিজ দিয়ে সচল রাখো। মানে যোগা-প্রাণায়ম, মেপে টেপে খাও। ওটস, ফল, মূল, আধ্যাত্মিক জগতে একটু বিচরণ করো। বুড়োবুড়িরা যেভাবে দিন কাটায় সেইভাবে চল। ভংচং বাবার শরণাপন্ন হও। অনেক বেড়িয়েছো।' উপদেশ শুনতে শুনতে পাগল হওয়ার উপক্রম। গৃহকাতরতা, বন্ধন, বিষয়আশয় অস্থায়ী জীবনের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত নিয়ে আমার মাথা ব্যথা নাই। কোনও কালেই ছিল না। আজ আছি কাল নেই। চোখ বুজলে তো ফক্কা। কে আগে যাবে— মানে প্রস্থান করবে জানি না। ললাটের লিখন কে কহিতে পারে। গিন্নীকে বলি, 'খাও দাও ঘোরো ফেরো। কাল কী হবে তার জন্য আজকের দিনটাকে কেন নষ্ট করবে?' ডেল কার্নেগীর এই আপ্তবাক্য আমার ভীষণ পছন্দ। মানে এনথু পাই। প্রতিটি দিন, প্রতিটি সকাল নতুন করে বাঁচার আনন্দ অনুভব করি। স্বপ্ন দেখি বেড়ানোর। বয়স যত বাড়ছে মনের বয়স ততই যেন কমছে। ওরে মন ভাবিস কেন অকারণ! এই জীবন কালীদা! লাগামছাড়া বাঁধনহারা জীবনটাই ভাল লাগে।

শৈশব, কৈশোরের সব স্মৃতি মনে নাই। আমি নিজেও জানি না। বোঝাতে পারব না কীভাবে ভ্রমণের নেশা একটু একটু করে শরীরে বাসা বেঁধেছে। অচেনাকে চেনা, অদেখাকে দেখার জন্য আকুলতা, ব্যাকুলতা এখনও। স্কুলে পড়াকালীন মনে মনে ভাবতাম দাদু, পিসিমাদের কাছে কত গল্প শুনতাম দেশের বাড়ির। ময়মনসিংহ, কিশোরগঞ্জ, মুক্তাগাছার কথা। তন্ময় হয়ে শুনে যেতাম। মুক্তাগাছা থেকে বড়মামা মন্ডার হাঁড়ি নিয়ে আসত শিলিগুড়িতে। আনত নোনা ইলিশ। ক্লাশ এইটে যখন পড়ি তখন থেকে মনে মনে বুদ্ধি আটি পাশপোর্ট করে দেখতে যাব পূর্ব বাংলা।

বাংলাদেশের তখন জন্মই হয় নাই। আর ভ্রমণের ভূত তখন থেকে মাথাটা চিবিয়ে খায়। পাশপোর্ট তো হল কিন্তু ভিসা কোথায়? বুদ্ধির অত পরিপক্কতা আসে নাই। বাবার কানে যেতেই বকাবকি আর মা-র নীরব সম্মতি। একাকী কলকাতায় আত্মীয়র বাড়িতে যাওয়া এবং থাকা। পূর্ব পাকিস্তানের কনসুলেট অফিসের খোঁজ খবর নিয়ে পৌঁছে গেলাম যাদবপুর থেকে বাসে চেপে বেকবাগানে। ক'দিন দৌড়ঝাঁপ করে ভিসা পেয়ে যাই। তখন শেয়ালদহ থেকে সবুজ রঙের ইস্টবেঙ্গল মেইল সকালের দিকে ছাড়ত। সোজা গেদে, ঈশ্বরদী, সাড়া সেতু হয়ে সিরাজগঞ্জ ঘাট। স্টিমারে চেপে ওপারে জগন্নাথগঞ্জ ঘাট। এখান থেকে ট্রেনে ময়মনসিং, তারপর বাসে মুক্তাগাছা। ব্যস সন্ধ্যার সাথে সাথে আটানীর বাজার। আমার জন্মস্থান। সে যে কী আনন্দ আজ আর ভাষায় প্রকাশ করতে পারব না।

একাকী বেড়ানোর আনন্দই আলাদা। বাড়ি থেকে পালিয়ে জলপাইগুড়ি যাওয়ার বৃত্তান্ত 'এখন ডুয়ার্স'-এ লিখেছি। পাসিং শোয়ে ফুঁ তিস্তা পাড়ে টুঁ। বয়স যখন মাত্র উনিশ কী কুড়ি মনে নাই, বর্ধমান রাজ কলেজে পড়ি। এক মাসের জন্য নিরুদ্দেশের পথিক। গয়া, কাশী, মথুরা, বৃন্দাবন, হরিদ্বার। কাশীর বাঙালিটোলাতে থাকতেন সাধু জেঠামশাই। ভাদাইমার মত ঘুরে বেড়ানো কাশীর অলিগলি। ধর্মকর্মে মোটেও আগ্রহ ছিল না। আজও নেই। বেনারসের ঘাট, গলিঘুঁচি, ষাঁড়দের গা ঘেঁষে, গোবর, ফুল বেলপাতার গন্ধে ভরা বিশ্বনাথের গলি। একটু এগলে গোধুলিয়া। কাশীর হৃদপিন্ড। কাশীর রাবড়ি এক কথায় অনবদ্য তেমনই পান ও পেয়ারা। দক্ষিণেশ্বরে, আদ্যাপীঠ কিম্বা তারাপীঠে যেমন নিত্য ভিড়। যৌবনে বেড়ানো এবং রাত্রি যাপন ছিল ধর্মশালা। হরিদ্বারে কালীকম্বলী বাবা, এলাহাবাদের হিউয়েট রোড (এখন নেতাজী সুভাষ চন্দ্র রোড) চামেলী দেবী ধরমশালা, বৃন্দাবন, মথুরাতে ধরমশালাই ভরসা। অনেক সময় বিপদ আপদেও পড়েছি, যেমন বিহার শরীফের ধরমশালাতে। ওটি যে চোর ছ্যাঁচ্চর মদারু গাঁজারুদের ঠেক মধ্য রাতে মালুম হয়েছিল। বেড়ানো বা ভ্রমণ যাই বলুন শস্তার রেলের ডাব্বায় না হলে বাসে চেপে গাদাগাদি ঠাসাঠাসি ভিড়ে হটযোগী হয়ে। খাঁটি ভ্রমণের স্বাদ।

ভ্রামণিকের পাঁচালি শেষ হওয়ার নয়। ক্যাম্বিসের ব্যাগ, খান দুই ধুতি, পায়জামা, খদ্দরের পাঞ্জাবী। ভ্রমণং যত্রতত্র শয়নং হট্টমন্দিরে। এভাবেই পরিক্রমা নৈনিতাল, বৈজনাথ, কৌশানী। সংসারের প্রতি বিতৃষ্ণা, বীতরাগ।

বছর তিনেক কলেজ জীবন কাটিয়ে যুক্ত হই মাহেশ শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে। উড়চন্ডী বাউন্ডুলে জীবন। বিশ্ববিদ্যালয়ের চৌকাঠ পার হতেই বড় মহারাজের নির্দেশে মায়ের কাতর অনুরোধে ফিরে আসা। কারণ পিতার অকাল প্রয়াণ। মন চলো নিজ নিকেতনে। সংসার ছেড়ে বিদেশে বিদেশীর বেশে ভ্রম কেন অকারণে।

তরাই জনপদের হৃদপিন্ড শিলিগুড়ি। কোথায় চাকুরি। আবার ঘর ছেড়ে বেড়িয়ে পড়া অসম থেকে অরুণাচল। শেষ পর্যন্ত সত্তরের দশকের শুরুতেই জুটে গেল গুরুগিরি মানে শিক্ষকতার চাকরি। তখন নকশাল আন্দোলনের দানা বেঁধেছে। রাজনীতির ডামাডোলের উত্তাল পরিবেশ। তাই বলে বেড়ানোর নেশায় কিন্তু ভাঁটা পড়েনি। তরাই ডুয়ার্সের বনে জঙ্গলে ফুরসৎ পেলেই চল যাই। বন্ধুরা মিলে গঠন করি ফ্রেন্ডস অফ ইন্ডিয়ান ওয়াইল্ড লাইফ। বিধান মার্কেটের কাছে আইডিয়াল ইন্সিটিটিউট। আমাদের আলোচনা আড্ডাটা ছিল বেড়ানো নিয়ে। শর্ত রাজনীতি থেকে শত হস্ত দূরে থাকা। বেড়ানোর লোকেশন অর্থাৎ হাল হকিকত আমিই খুঁজে বের করতাম। বলা বাহুল্য নাটের গুরু ছিলাম আমি। মাঝে মাঝে উপেন দাশগুপ্ত, শিবশ্যামদার সাথে আড্ডা জমে উঠত। মানেভঞ্জন থেকে হেঁটে সান্দাকফু, ফালুট। ৪০ বছর আগে চামুরচি, জয়ন্তী, মহাকালে। দুর্বার গতিতে শুধু ঘুরে বেড়ানো। হেডস্যার নারায়ণবাবু বলতেন— 'গৌরী তোমার ছুটির হিসাবটা ঠিক রেখ। একটু মন দিয়ে পড়াও। এভাবে ঘুরে বেড়ালে চলবে?' অলক্ষে চিন্তামণি হয়ত হাসছেন। শেষ পর্যন্ত একদিন টোপর মাথায় দিয়ে চললাম পাথরঝোরায় সাত পাকে বাঁধা পড়তে। ফাল্গুনী ঝোরো হাওয়ার মধ্যে। সেও এক বিচিত্র ঘটনা মানুষ ভাবে এক হয় আরেক।

ছিলাম একা দিব্যি মহানন্দে ঘোরাঘুরি। বিবাহ মানে বোকা হওয়া। অর্ধাঙ্গিনী চাকরি করে ফাঁসিদেওয়ায়। আমি কখনও মা-র উপর ছেড়ে দিয়ে বেরিয়ে পড়তাম। শেষ পর্যন্ত দু'জনে বেরিয়ে পড়া কাছে দূরে যেখানে সেখানে। কখনও একা। আত্মীয়স্বজন থেকে বিষয়ী মানুষজন বলত, 'বাপু এভাবে ঘুরে বেড়িয়ে টাকাপয়সা উড়িয়ে লাভ কী? টাকাপয়সা জমাও। বহু স্কীম আছে।' উত্তরে বলতাম, 'অর্থম অনর্থম ভাবায় নিত্যম। সবই তো পড়ে থাকবে। লোটা কম্বল নিয়ে স্বর্গে যেতে পারব না। অচেনা অদেখার আনন্দে বিভোর থাকাই ভাল। তোমরা চুটিয়ে টিউশুনি কর। ভালমন্দ খাও।' যাইহোক বিয়ের পর দু'জনের প্রথম যাওয়া পানিঘাটা চা-বাগানে। চা-বাগিচায় হানিমুন বলা যায়। বন্ধু বিমল টোকলাই থেকে ট্রেনিং নিয়ে সহকারী ম্যানেজার। ওর অনুরোধে অ্যাম্বাসেডার গাড়ি ভাড়া করে বেড়াতে যাওয়া। মাটিগাড়া, নিঝুম শিব মন্দির, মফঃস্বলী বাগডোগরা ছাড়িয়ে ডান দিকে বাঁক নিলে কমলপুর, বেঙডুবি হয়ে অর্ড, ত্রিহানা হয়ে পানিঘাটা। ওপারে দুধিয়া। সম্প্রতি

বিমল পৃথিবীর মায়া কাটিয়ে বিদায় নিয়েছে। গিন্নির জন্ম চা-বাগানে হওয়ার কারণে তেমন কৌতুহল না থাকলেও বন্ধু পত্নীর সঙ্গে ঘরসংসার নিয়ে আলোচনা এবং আমি অকর্মার ঢেকি ও লাউ লবণ শূন্য আদ্যিকালের মানুষ। ধুতি শার্ট পাঞ্জাবী ঝোলা নিয়ে কেউ চলাফেরা করে! বনজঙ্গল নিয়ে পাগলামি করে! যত বলি আমাকে আমার মত চলতে থাকতে দাও তাতে তক্কাতক্কি জমে উঠত।

দু'জনে কোথায় না গেছি! তার ধারাবাহিক ইতিহাস লিখতে সুবিধা হত যদি ডায়েরি লিখতাম। 'এখন ডুয়ার্স'-এর স্নেহভাজন প্রদোষের গুঁতো-তাগাদা অপার ভালবাসা সর্বোপরি আন্তরিকতা যার মধ্যে খাদ নাই। ছাইভস্ম যা লিখি তাই ছাপে। কোনও আত্মম্ভরিতা নেই। বড় ভাল ছেলে। ওর অনুরোধ— স্যার বউদিকে নিয়ে কত জায়গা তো গেছেন। অল্পমধুর অভিজ্ঞতা একটু-আধটু আমাদেরকে শোনান। মুখে নয়, লিখে ফেলুন। তারপর তাগাদা। এই তাগাদা জীবনে লেখার জন্য পেয়েছি ধূপগুড়ি থেকে প্রকাশিত লালনক্ষেত্র, যুগান্তর, সাপ্তাহিক পরিবর্তন, লং জার্নি, লেটস গো আরও নানা পত্রপত্রিকা থেকে। মাঝে মাঝে মনে হয় দূর ছাই কী হবে এমন লিখে। বড়াই করার কিছু নাই। বাগাড়ম্বর না করাই ভাল। তা না হয় হল।

বেড়ানোর ভূত কিন্তু কাঁধে চেপে আছে। নাছোড়বান্দা। খিড়কি থেকে সিংহদুয়ার। এই তোমাদের পৃথিবী। এর বাইরে জগৎ আছে তোমরা জানো না। সত্যি বলছি চার দেওয়ালের মধ্যে থেকে ভীষণ একঘেয়ে, হাঁপিয়ে উঠি। তখনই মন বলে চলো দূরে অদূরে কোথাও গিয়ে নিশ্চিন্তে কাটিয়ে আসি। তবে ওই যে প্রবাদ পথি নারী বিবর্জিতা। কেউ বলেন মেয়েছেলে সঙ্গে নিয়ে বের হলে অনেক ঝামেলা, সমস্যা, লাফরা। সমস্যা একা ঘরের বাইরে পা ফেললে পেছন থেকে টেনে ধরে। হাজার হোক বয়সটা তো উপেক্ষা করা যায় না। তারুণ্যের জোয়ারে জগবগ করে ফুটলে তো চলবে না। কয়েক বছর আগে বোর্নিওর জঙ্গলে হাঁটতে গিয়ে বারবার মালুম হল। বাপু হে রয়েসয়ে চল। বউ বলুন, গিন্নি বলুন, সহধর্মিনী যাই বলুন সত্যি বলছি শেষ বয়সের লাঠি। রণে বনে জঙ্গলে গাড়িতে গেলে তিনি আছেন। বেড়াতে গিয়ে কম ভোগান্তি সমস্যা বিপদ আপদের সম্মুখে পড়তে হয়নি।

মনে পড়ে একবার তাও ৩০ বছর আগের কথা, ওদলাবাড়িতে নেমে দেখি পাথরঝোরা যাবার কোনও বাহন নেই। সম্বন্ধীকে জানাবারও কোনও উপায় নেই। এদিক ওদিক তাকাই। শেষমেষ এক রিকশাওয়ালাকে বাবা-বাছা করে রাজি করাই। হাবাগোবা রিকশাওয়ালা। পাথরঝোরার ভূচিত্র তাঁর অজানা। নামই শোনে নাই। মানাবাড়ি, তুরিবাড়ি ছাড়ালেই পথ ক্রমশ চড়াই। সে যে কি বিড়ম্বনা। রিকশা থেকে নেমে আমাকে ঠেলতে ঠেলতে পথ চলা সে এক অভিনব দৃশ্য। গিন্নি সুটকেস সহ রিকশায় বসা আর আমি ঠেলছি। হে বাবু তুই মোক কোথা নিয়া যাছিস। হাঁটুতে হাঁটুতে নহবৎ। অনেক কসরৎ করে পৌঁছাতে পারলাম পাথরঝোরাতে। আজ বুড়ো বয়সে বসে লিখতে বসে হাসি পাচ্ছে। চা-বাগানের বাবু, ম্যানেজার, কুলি-কামিনদের মধ্যে সে কি শোরগোল, আলোচনা, হাসাহাসি। পাথরঝোরায় রিকশাতে আবার কে এল। কোয়ার্টারে পৌঁছে রিকশাওয়ালা বাইরের বারান্দায় লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ে হাঁপাচ্ছে। বলে— 'হামাক কথাটা আগত কেনে কন নাই'। অনেক যত্ন করে খাইয়ে দাইয়ে উপযুক্ত দক্ষিণা দিই। গিন্নি বলে— এখন তোমার কোনও সমস্যা হবে না। গড়গড়িয়ে পৌঁছে যাবে ওদলাবাড়ি। দু'দিন আগে ওদলাবাড়িতে যাই। এখন বিলকুল শহুরে ছোঁয়া। চেনা যায় না। লোকজন, দোকান পশার, গাড়িঘোরায় ঠাসা। তবে সেই মরুদ্যান, বাটা আছে। নেই কণক টকিজ। চক্রবর্তীবাবু, বাবলু, চেনা অজানা মানুষজন। রীতিমতন শহুরে চিত্র। তবে দু'কদম গেলে ওদলাবাড়ি চা-বাগান, কৈলাশপুর, আনন্দপুর, তারঘেরা, আপালচাঁদ ফরেস্ট, ক্রান্তি, গজলডোবা, বোদাগঞ্জ, সরস্বতী চা-বাগান, জঙ্গল। গতবছর সস্ত্রীক জ্যৈষ্ঠের ঠা ঠা রোদ্দুরে শান্তিতে কাটিয়ে গেছি হাওয়া মহলে। গিন্নি বলে— হাসছ কেন লিখতে বসে?

বছরের হিসেব করে কি ধারাবাহিক ভ্রমণ বৃত্তান্ত বলা যায় কোথায় কবে কখন গেছি? তা সে পাহাড়ে, সমুদ্রে, জঙ্গলে, গ্রামগঞ্জে দু'জনেই বেরিয়ে পড়ি। হোমস্টে-র তখন জন্মই হয় নাই। সম্ভবত নয়ের দশকে তিনচুলের গুরুং পরিবার, সেখান থেকে প্রধানদের বড়া মাঙ্গোয়া, পেশক ডাকবাংলো। কোনও বছর ঘুমের অদূরে লেপচাজগত, কালিংপঙের কাছে রংপো, জলসা বাংলো, পেডংয়ের নীল পাহাড়ি। আহা কী আনন্দময় সফর ডামসাঙ্গরি। রংলি পেরিয়ে লিংতাম জুলুক কিংবা রেনক পেরিয়ে আরিটার। রকি আইল্যান্ড স্নেহভাজন ছাত্র বাবলুদের তাঁবুতে থাকার অভিজ্ঞতা। যতদূর মনে পড়ে ভজন ভাইয়ের বউভাত রকি আইল্যান্ডে অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

এখন পাহাড় জুড়ে হোমস্টে-র ছড়াছড়ি। খদ্দের বা ভ্রমণ পিপাসুর চৌদ্দ আনাই বঙ্গ পরিবার। অনেকে শস্তায় থাকা-খাওয়ার খোঁজখবর নেন। তাঁবুর কথা মনে পড়লে অরুণাচলের মায়ানমার সীমান্তে নামপঙের কথা মনে পড়ে যায়। পাংসাউ পাস উৎসবে যাওয়া। উফ! রাতের বেলায় কী ভয়ংকর হাড়পাঁজর কাঁপানো হিমশীতল ঠান্ডা। তারপর একদিন মায়ানমারে লেক অফ নো রিটার্ন-এ বেড়ানো এবং তাংসা জনজাতির গাঁয়ে সারাদিন কাটানো। বলা বাহুল্য গিন্নিকে সঙ্গে নিতেই হয়। স্মৃতি এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। আমার প্রতি গিন্নির তীক্ষ্ণ নজর। বুদ্ধির ঘটে ধোঁয়া দিচ্ছি কিনা। সুরাপান করছি কিনা। এদিক ওদিক হলে হ্যাঁচকা টান। মনে পড়ছে অভিনেতা ধৃতিমানবাবুর সঙ্গে বসে একটু আড়ালে সিগারেট খাওয়া। ধুমপান এখন ছেড়ে দিলেও তখন মহাসুখে ফুঁকে চলেছি। মনের মানুষ গৌতমবাবুর থেকে একটা দুটো নিয়ে নেশা মেটানো। আর গুনুংমুলু ন্যাশনাল পার্কে মাঝে মধ্যে লুকিয়ে গাইড মাইকেলের কাছ থেকে। যখন অকৃতদার ছিলাম তখন ঘাটশিলার ফুলডুংরি টিলায় বসে মহুয়া রস পান। ডুয়ার্সের হাটে মাঠে ঘাটে একাকি ঘুরে বেড়ানোর সময় একটু আধটু হাড়িয়ার স্বাদ নেওয়া। স্নেহভাজন কবি সমীরণ ঘোষ বলত, 'গৌরীদা দু' চুমুক দিন দেখবেন দিব্যচক্ষু খুলে গেছে।' দুঃখ হয় বড় অকালে সমীরণ পৃথিবী থেকে বিদায় নিল। মাল কানন উদ্যানের ভিতরে মাধবীকুঞ্জে সস্ত্রীক থাকার সময় সমীরণ পুত্র সব্যসাচীকে নিয়ে সন্ধেবেলা আসত। রহস্যময় রোমান্টিক এনচ্যান্টিং ডুয়ার্স এখনও হাতছানি দেয়। দুদিন আগে ঘুরে আসি রায়ডাক জঙ্গলের রায়ডাক নেস্ট-এ।

বেড়াতে বেরিয়ে কম ফ্যাসাদে পড়তে হয় নাই, সেসব নিয়ে যদি লিখতে বসি মহাভারতে পরিণত হবে। বছর চল্লিশের বেশি হবে বোধহয়। ঠিকঠাক করে ফেলেছি হপ্তাখানেক সিমলিপাল জাতীয় উদ্যানে টানা সফর করব। প্রথম বনবাংলো চাহালা, তারপর বরাহপানি, ধুধুরচম্পা, জোরান্ডা। অতশত এখন মনে পড়ছে না। পুরী ভ্রমণ সমাপ্ত করে স্বর্গদ্বার থেকে বাসে চেপে রওনা হই ভোরবেলায় যশীপুরের উদ্দেশে। সিমলিপালে প্রবেশের সদর দরজা যশীপুর। সে সময় যশীপুরে বিখ্যাত পোষা বাঘ খৈরী, অন্ধ ভল্লুক নিয়ে কবি শক্তি চাটুজ্জে লিখে আরও বিখ্যাত করেছেন। কাগজপত্রে, টেলিফোনে, টাকা পাঠিয়ে সব ঠিকঠাক। রেশন তুলতে হবে, মানে ক'দিনের খাওয়ার ব্যবস্থা এবং বাহন বলতে জিপ। কিন্তু অভিজ্ঞতা না থাকলে যা হয়। বাংরিপোশি, বারিপাদা হয়ে যশীপুর যখন পৌঁছাই তখনই সন্ধে ঘনিয়ে এসেছে।

বিলম্বের আরও কারণ বাসের চাকা পাংচার। কত কী! যশীপুর তখন মফঃস্বলি গাঁ-গঞ্জ। বাস থেকে নেমে রীতিমত বেকুব হই আর গিন্নির মুখঝামটা— 'কেমন মানুষ তুমি? এখন কী হবে?' —মাথার উপর ভগবান আছে। নো টেনশন। চলো যাই ওই মিঠাই কা দোকানে। গরম জিলাপি, সিঙারা, চপ, চা খদ্দেরদের ভিড় উপচে পড়ছে। তার মধ্যে আমি গিয়ে উটকো প্রশ্ন করি এখানে মাথা গোঁজার ঠাই হবে, মানে ঠহরনেকা জায়গা। আমার প্রশ্নের উত্তর দেবে কী খদ্দের নিয়ে ব্যস্ত। তারই মধ্যে বলে— এখানে ভাল হোটেল নাই। সরকারি বাংলোতে আপনি জায়গা পাবেন না। দেহাতি জায়গা, কেউ রাত্রিবাসের জন্য আসে না। তাহলে তোমার মিষ্টির দোকানে রাতে আমাদের একটু থাকতে দিও। এত কথা শোনে কে। এমন সময় এক ভদ্রলোক সিঙারা জিলিপি কিনতে এসেছেন। আমার কথাবার্তা শুনে বললেন— যদি কিছু মনে না করেন তাহলে আমার একটা সাজেশন। আপনি স্ত্রীকে নিয়ে সোজা চলে কাছেই ডাক্তার রায়ের বাড়ি। ডাক্তারবাবু টুরিস্টদের জন্য থাকার ব্যবস্থা করেছেন কয়েকটি ঘরে। এখান থেকে সামান্য দূরত্বে। যদি জায়গা না পান তো আমার বাড়িতে না হয় একটা রাত থাকবেন। এই রাখুন ফোন নং। উনিই একটা রিকশা ডেকে দিয়ে বললেন— এনাদেরকে ডাক্তার রায়ের বাড়িতে নিয়ে যাও। যাওয়ার সময় উনি বললেন— কোনও টেনশন করবেন না। আমি আছি। রিকশাওয়ালাকে বললাম— 'ভাই একটু অপেক্ষা কর। সিঙারা, চা একটু খাই। তারপর।' রিকশাওয়ালা রাজি হওয়াতে তুষ্ট হই।

মুহূর্তে মিলিয়ে গেল দোকানপশার। ডাইনে বাঁয়ে জমাট অন্ধকার। টিমটিমে আলো, জোনাকির ফুলকি, আর হু হু হাওয়া। দু'জনেই ভীত, কিংকর্তব্যবিমূঢ়। ভাই কত দূরে। ওড়িয়া রিকশাচালক বলে, 'আমার জানা নেই। তায় এক কিলোমিটারের বেশি চলে এসেছি, হঠাৎ দেখি বাঁ দিকে ডুম জ্বলছে। ডাক্তার রায়ের সাইনবোর্ড। বুকের ধুকপুকুনি কমল। রিকশাচালককে বললাম— 'ভাই অপেক্ষা কর। আগে যাই বাক্যালাপ করি, বুঝি। না পেলে তোমার রিকশাতেই ফেরৎ যাব। দরজার কাছে পৌঁছে দেখি কোথায় রোগীপত্তর। বুড়োদের গেঁজুগপ্পো চলছে। আমাকে দেখে ওনাদের কথাবার্তা বন্ধ। — কাকে চাই।

—না মানে ডাক্তার রায়?

—ওই যে বসে আছেন।

ভাবলেন পেশেন্ট এসেছে। ডাক্তারবাবুর প্রশ্ন

—বলুন কী ব্যাপার?

—একটা রাত্রি থাকতে চাই। আজকেই আমাদের সিমলিপালের চাহালা বনবাংলোতে বুকিং ছিল। আরও অনেকগুলো বাংলোতে। আপনি একা?

—না, স্ত্রী সঙ্গে আছে।

—কোথায়?

—ওই যে রিকশায়।

—কী কান্ড! ডাকুন। লাগেজপত্র নিয়ে আসুন।

রিকশাওয়ালাকে বলুন নিয়ে আসতে।

গিন্নির মুখে একটু হাসি ফুটল।

ডাক্তারবাবু বললেন— আসুন ঘর দেখে যান। আহামরি কিছু নয়। টয়লেট বাইরে।

বললাম —চলবে।

—দক্ষিণা মাত্র ১৪ টাকা।

—ঠিক আছে।

—কিন্তু কাজ কিছু বাকি আছে। রাস্তার ওপারে ঘনার দোকানে গিয়ে রাতের আহার ভাত না রুটি খাবেন বলতে হবে। তারপর টাইগার প্রজেক্টে খবর দিতে হবে। ব্যাপারটা আমি দেখছি। আগামীকাল আপনাকে মুদির দোকান বলে দেব। জিপ গাড়িও চলে আসবে। এখন রাত। না যাওয়াই ভাল।

মনে করতে পারছি না সে সময় পোষা বাঘ খৈরী বেঁচে ছিল কি না। ঘনার দোকানে গিয়ে বলে আসি। ঘনার প্রশ্ন এখানে এসে খাবেন না পাঠিয়ে দেব।

বললাম— পাঠিয়ে দিলেই তো ভাল। বেশ। এখন যদি পার চা পাঠাতে পার। আর কিছু চাই না।

পতির পুণ্যে সতির পুণ্য না হলে খরচ বাড়ে। খরচ নয়, ঝামেলা অনেক সইতে হয়। হাজার হোক নিরাপত্তা, পরিবেশ, স্বাচ্ছন্দ্য কত কী ভাবতে হয়। পুরুষদের চেয়ে মেয়েদের নিরাপত্তা, শান্তি সর্বাগ্রে ভাবা উচিত। মনে পড়ছে যৌবনে হরিদ্বার কয়েকদিন থেকে এদিক ওদিক করে সবার শেষে বাসে দিল্লি ফিরছি। গন্তব্য নিউ দিল্লির পাঞ্জাবী বাগ। পথিমধ্যে বাস খারাপ। দিল্লি পৌঁছতে রাত হয়ে যায়। তারপর বাস গলির মুখে এমন জায়গায় নামিয়ে দেয় যে কিছুতেই আমি আশ্রয়স্থল খুঁজে বের করতে পারছি না। আমারই এক ছাত্রের বাড়িতে উঠেছিলাম। তখন মোবাইল কোথায়। নিঝুম পথঘাট। দুষ্টু লোক সর্বত্র। আবার ভাল লোকও আছে। অটো চালকও বিরক্ত হয়। গলি গলি ঢুঁড়তে ঢুঁড়তে শেষমেষ ঠিক করি স্টেশনে চলে যাব। প্ল্যাটফর্মে রাত কাটিয়ে সকালবেলায় খুঁজে বের করব। এমন সময় এক পাগড়ি বাবা সহায় হলেন। উনি বসলেন আমাদের সঙ্গে। কুয়াশায় কিছুই ঠাহর করা যাচ্ছে না। ওনার চেষ্টায় শেষ পর্যন্ত খুঁজে বার করি। রাত তখন ১১টা বেজে গেছে। আমার শুধু এইটুকু মনে আছে স্থানীয় এমএলএ-র বাড়ি এবং একটা আটা চাকির কাছে। ছাত্রকে বিব্রত করা। সেও অবাক, এত রাতে স্যার কীভাবে এলেন। ভয়ে গিন্নির বুক ধুকপুক করছিল।

এমন হয় কাঠমান্ডুতে পৌঁছে। সবে আশির দশকের শুরু। সকাল দশটায় কাঠমান্ডু পৌঁছে আর বন্ধুর বাড়ি খুঁজে পাই না। ঘণ্টা তিনেক গরু খোঁজা। মনে আছে সপ্তমীর পুজো মহাসমারোহ শুরু হয়েছে। বাকিটুকু দীর্ঘ বৃত্তান্ত। ওসব পাঁচালি থেকে বিরত থাকাই শ্রেয়। ভ্রমণে বিভ্রম ব্যাঘাত আনন্দ কতরকম ঝামেলা। বাসে তেজপুর থেকে রওনা হয়ে বাইহাট্টা চারালিতে অগপ'র আন্দোলনে আটকে পড়া, ভাঙচুর। শেষপর্যন্ত বাসশুদ্ধু থানাতে। রাতে বঙ্গাইগাঁও থেকে আসাম মেল চেপে মধ্যরাতে আলিপুরদুয়ার। গুঁতোগুঁতি, ঠাসাঠাসি ভিড়। পাগলের মধ্যে অবস্থান।

এখন বয়স বেড়েছে। যৌবনের উন্মাদনা স্তিমিত। বেড়ানোর সুযোগ-সুবিধা শতগুণে বেড়েছে। বরিষ্ঠ নাগরিকের তকমা জুটে যাওয়াতে সুযোগ-সুবিধা পাচ্ছি দু'জনেই। বাতানুকুল না হলে উড়ো জাহাজেও চড়ে ঘুরে বেড়াই। অস্বীকার করার উপায় নাই, একটু আরামপ্রিয় তো হয়েছি। অপ্রিয় কথা অকপটে স্বীকার করতে কোনও কুণ্ঠা নাই। বারান্তরে মিয়া-বিবির বেড়ানোর আরও বৃত্তান্ত শোনাব।

এবারের নির্বাচনে ভোটার তালিকায় নেই ২.১ কোটি নারী !

রাখি পুরকায়স্থ

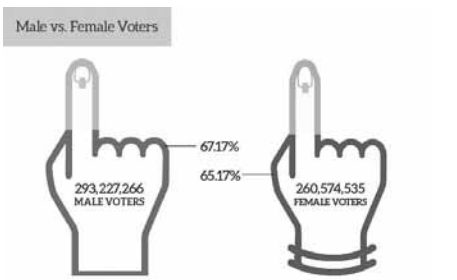

নারীদের ভোটাধিকার আজ প্রায় সারা বিশ্বে স্বীকৃত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে জাতিসংঘ নারীদের ভোটাধিকারকে উৎসাহিত করতে থাকে এবং ১৯৮১ সালে 'নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ' নামক সনদটিতে জাতিসংঘের ১৮৯টি সদস্য রাষ্ট্রের মধ্যে নারীদের ভোটাধিকারকে একটি মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। বর্তমানে কোনও রাষ্ট্রশক্তির পক্ষেই নারীদের ভোটাধিকার প্রয়োগে বাধা সৃষ্টি করা সম্ভব নয়। কারণ, এতে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে সেই দেশের খ্যাতিতে গুরুতর আঘাত আসতে বাধ্য। তবে আইনত নারীদের ভোটাধিকারকে স্বীকৃতি প্রদান করা এক বিষয়, আর সেই অধিকারকে বাস্তবে রূপান্তরিত করা একেবারেই ভিন্ন ব্যাপার। আসলে বাস্তব রূপায়নের পথটি সবসময় খুব একটা সুগম নয়। গতানুগতিক নিয়মে রাজনীতিকে পুরুষদের একচেটিয়া এলাকা বলে চিহ্নিত করার ফলে পুরুষতান্ত্রিক সামাজিক কাঠামো রাজনীতিতে নারীদের তুলনায় পুরুষদের অংশগ্রহণ ও মতামতকে অনেক বেশি গুরুত্ব প্রদান করে। আর সব সমস্যার সূত্রপাত সেখানেই।

ভারতের ভোট ময়দানের চিত্রটিও তাই মোটেই আলাদা কিছু নয়। এখানে সার্বিকভাবে নারীদের ভোটাধিকার প্রয়োগের হার পুরুষদের ভোটাধিকার প্রয়োগের হারের চাইতে অনেক কম। অবশ্য ২০১৪ সালের সাধারণ নির্বাচনের নিরিখে বিচার করলে বোঝা যায় সেই ব্যবধান ক্রমশ কমে আসছে। কিন্তু বাহ্যত সংখ্যাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রাপ্ত সংখ্যা দেখে সবসময় সত্য উৎঘাটিত করা যায় না। কারণ তারই মাঝে কোথাও লুকিয়ে থাকে সামষ্টিক স্তরে লিঙ্গ বিভেদের করুণ ছবি। সংখ্যাতত্ত্বের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যের যথাযথ ব্যবচ্ছেদের মাধ্যমেই ভারতীয় রাজনীতির পূর্ণাঙ্গ ছবি জনসমক্ষে আসা সম্ভব।

ভারত স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৫২ সালের প্রথম সাধারণ নির্বাচনের সময় থেকেই ভারতীয় নারীরা জনপ্রতিনিধি নির্বাচনে ভোটাধিকার প্রয়োগ করে চলেছেন। অনেক ঐতিহাসিকেরাই মনে করেন, ভারতের মত বিপুল জনসংখ্যার একটি উত্তর-ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের জন্য এটি একটি 'বিস্ময়কর কৃতিত্ব'। নির্বাচন বিশেষজ্ঞদের মতে, ভারতীয় নারীরা খুবই উৎসাহী ভোটদাতা। সবচাইতে বড় কথা, ইদানীং অনেক মহিলারাই বলছেন, পিতা, স্বামী কিংবা পরিবারের অন্যান্যদের সাথে পরামর্শ না করেই স্বাধীনভাবে ভোটাধিকার প্রয়োগ করছেন তাঁরা। নারীরা আজ রাজনৈতিকভাবেও আগের তুলনায় অনেকটাই সচেতন। রাজনৈতিক দলগুলিও এখন নারীদের একটি পৃথক নির্বাচকমণ্ডলী হিসাবে গণ্য করে থাকে। তাই নারীদের

বিশ্লেষকেরা মনে করছেন, দেশের চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় ২০ মিলিয়নের বেশি নারী ভোটদাতার অনুপস্থিতির অর্থ প্রতিটি নির্বাচনী এলাকার ভোটার তালিকায় গড়ে ৩৮০০০ নারী ভোটদাতা অনুপস্থিত। উত্তরপ্রদেশের মত জনবহুল রাজ্যে প্রতিটা নির্বাচনী এলাকায় সেই সংখ্যাটা বেড়ে ৮৪,০০০ পর্যন্ত হতে পারে ! ঝাড়খণ্ডের মত রাজ্যে পরিস্থিতি এতটাই গুরুতর যে, পরিসংখ্যান অনুযায়ী, একজন নারী সেখানে ভোট দিচ্ছেন মানে আরেকজন নারী সেখানে ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত।

আকর্ষণ করবার জন্য সস্তার রান্নার গ্যাস, পড়াশোনার জন্য বৃত্তি, বিদ্যালয়ে যাওয়ার জন্য বাইসাইকেল প্রভৃতি বিশেষ সুযোগ সুবিধা প্রদান করা হয়।

সবচেয়ে আশার কথা হল নির্বাচন বিশেষজ্ঞরা ২০১৯ সালের সাধারণ নির্বাচনের আগে থেকেই বলে এসেছেন, এবারকার নির্বাচনে নিবন্ধিত নারীদের সংখ্যা যদিও নিবন্ধিত পুরুষের সংখ্যার চেয়ে কম, তবুও

২১ মিলিয়ন নারী ভোটদাতার নাম এবারকার চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় অনুপস্থিত

নির্বাচনে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে নারীরা পুরুষদের অতিক্রম করে যাবে। নারীদের এমন উচ্চ হারে অংশগ্রহণের পেছনে বিভিন্ন কারণ রয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। আগের তুলনায় নারীরা এখন অনেকটাই রাজনৈতিকভাবে সচেতন। সেইসাথে উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে তাঁরা স্বাধীন মত প্রকাশের ক্ষমতা অর্জন করেছেন। তাছাড়া নারীদের জন্য আরও ভাল প্রতিনিধিত্বের দাবিতে সরব নারীরা এখন তাঁদের নির্বাচনী অধিকার প্রয়োগে আগের তুলনায় অনেক বেশি উৎসাহী। আরেকটি ইতিবাচক দিক হল কিছু ছোট রাজ্যে নিবন্ধিত নারীদের সংখ্যা নিবন্ধিত পুরুষদের তুলনায় বেশ বেশি। সঠিক কারণগুলি নিশ্চিত করবার জন্য যদিও আরও অনেক গবেষণার প্রয়োজন, তবুও একটু উপর উপর নজর দিলে রাজ্যগুলির আঞ্চলিক বৈচিত্র্য, আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অগ্রগতিকেই প্রাথমিক কারণ হিসেবে বেছে নিতে হয়।

কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার, সম্প্রতি প্রকাশিত The Verdict: Decoding India's Elections বইটিতে নির্বাচন বিশেষজ্ঞ লেখকদ্বয় প্রণয় রায় ও দোরাব সোপারিওয়ালা দাবি করেছেন, ভোটাধিকার প্রয়োগে সক্ষম ভারতের নারী জনসংখ্যার একটা বিশাল অংশ— প্রায় শ্রীলঙ্কার জনসংখ্যার সমান— ভোটার তালিকায় অনুপস্থিত! ২০১১ সালের জনগণনা থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে জানা যায়, ৯৭.২ শতাংশ ভারতীয় নারীর বয়স ১৮ বছর বা তার ওপরে। এই তথ্যের ভিত্তিতে বলা যায়, অন্তত ৯৭.২ শতাংশ নারীর ২০১৯ সালের সাধারণ নির্বাচনে ভোটদানের যোগ্যতা রয়েছে। কিন্তু ২০১৯ সালের নির্বাচনে ভোটদানের জন্য কেবলমাত্র ৯২.৭ শতাংশ নারীর নাম নিবন্ধিত হয়েছে! ভোটাধিকার প্রয়োগে সক্ষম নারীদের শতকরা হার এবং নিবন্ধিত নারীদের শতকরা হার পাশপাশি রাখলেই ব্যবধান স্পষ্ট হয়ে যায়। প্রথম নজরে ৪.৫ শতাংশ ব্যবধান তেমন গুরুতর মনে না হলেও, এই শতকরা হারকে তার প্রকৃত সংখ্যায় রূপান্তরিত করলেই বোঝা যায় উদ্বেগের আসল কারণ—এ বছরের সাধারণ নির্বাচনে ২১ মিলিয়ন নারী ভোট দিতে পারেননি! অর্থাৎ ২১ মিলিয়ন নারী ভোটদাতার নাম এবারকার চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় অনুপস্থিত!

তবে ভোটার তালিকায় নারী ভোটদাতাদের অনুপস্থিতির ক্ষেত্রে আঞ্চলিক পার্থক্য বেশ স্পষ্টভাবে চোখে পড়ে। দেখা যাচ্ছে হিন্দি বলয়ের অবস্থা সবচাইতে খারাপ। ভোটার তালিকায় অনুপস্থিত ২১ মিলিয়ন নারী ভোটারদের অর্ধেকের বেশি উত্তরপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র এবং রাজস্থান— এই তিনটি রাজ্যের বাসিন্দা। অন্ধ্রপ্রদেশ ও তামিলনাড়ুর মত দক্ষিণী রাজ্যগুলির অবস্থা এক্ষেত্রে অনেকটাই ভাল। বিশ্লেষকেরা মনে করছেন, দেশের চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় ২০ মিলিয়নের বেশি নারী ভোটদাতার অনুপস্থিতির অর্থ প্রতিটি নির্বাচনী এলাকার ভোটার তালিকায় গড়ে ৩৮০০০ নারী ভোটদাতা অনুপস্থিত। উত্তরপ্রদেশের মত জনবহুল রাজ্যে প্রতিটা নির্বাচনী এলাকায় সেই সংখ্যাটা বেড়ে ৮৪,০০০ পর্যন্ত হতে পারে! ঝাড়খণ্ডের মত রাজ্যে পরিস্থিতি এতটাই গুরুতর যে, পরিসংখ্যান অনুযায়ী, একজন নারী সেখানে ভোট দিচ্ছেন মানে আরেকজন নারী সেখানে ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত। এই বিরাট সংখ্যক অনুপস্থিত নারীরা অনেক নির্বাচনী আসনের ফলাফলই আমূল পালটে দিতে পারতেন। ভোটার তালিকায় এই বিপুল সংখ্যক নারীরা যদি উপস্থিত থাকতেন, তবে এবারকার নির্বাচনে ভোটদাতার সংখ্যা অনায়াসে ৯০০ মিলিয়ন ছাড়িয়ে যেত। তাছাড়া যদি কোনও নির্বাচনী এলাকায় লিঙ্গ অনুপাতে তীব্র বৈষম্য থাকে, অর্থাৎ যদি সেখানে নারীদের সংখ্যা পুরুষদের তুলনায় অনেক কম হয় এবং সেখানকার সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটদাতা যদি পুরুষ হয়, তবে মহিলা ভোটদাতাদের পছন্দ-অপছন্দ সেখানে স্বাভাবিকভাবেই উপেক্ষিত হবে। অনেকেই তাই মনে করছেন, জনপ্রতিনিধি নির্বাচনের ফলাফলে নারীদের পছন্দ কখনই প্রতিফলিত হয় না, প্রকাশ পায় কেবল সংখ্যাগরিষ্ঠ পুরুষদের মনের ইচ্ছে।

তবে তার মানে কিন্তু এই নয় যে নির্বাচন কর্তৃপক্ষ আরও বেশি সংখ্যক নারীদের ভোট যজ্ঞে সামিল করার চেষ্টায় পরিশ্রম করেনি। এবারেও নির্বাচন কমিশন কঠোর পরিসংখ্যান পদ্ধতি গ্রহণ করেছে। লিঙ্গ অনুপাত, ভোটদাতা-জনসংখ্যা অনুপাত, ভোটদাতাদের বয়স ইত্যাদি তথ্যদি সংগ্রহের মাধ্যমে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে যাতে যোগ্য ভোটদাতারা ভোটার তালিকা থেকে বাদ না পড়ে যান। ভোটদাতাদের দোরগোড়ায় গিয়ে তাঁদের সম্পর্কিত জরুরি তথ্যাবলী যাচাই করা হয়েছে। এই প্রক্রিয়ায় জড়িত বেশিরভাগ কর্মকর্তারাই নারী। গ্রামে শিশু কল্যাণ কর্মী এবং স্বয়ম্ভর গোষ্ঠীর নারীদের দলগুলিকে এ কাজে নিযুক্ত করা হয়েছে। সরকার পরিচালিত টিভি ও রেডিও অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ভোটদানের উদ্দেশ্যে নাম নিবন্ধিকরণে উৎসাহিত করা হয়েছে নারীদের। এমনকি কেবলমাত্র মহিলাদের জন্য ভোটকেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে সারা দেশ জুড়ে।

তাহলে এখনও এত নারী কেন ভোটার তালিকায় অনুপস্থিত? উত্তর খুঁজতে গিয়ে এক ঝাঁক সম্ভাব্য কারণ আমাদের সামনে উঠে এসেছে—

১) বিয়ের পর অধিকাংশ নারীরাই ঠিকানা পরিবর্তন করেন, কিন্তু নতুন করে ভোটার তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্ত করতে ব্যর্থ হন। ২) ভোটার তালিকায় নাম প্রকাশের জন্য কর্মকর্তাদের হাতে পরিবারের লোকজন মেয়েদের ছবি তুলে দিতে চান না। ৩) মাতাপিতারা তাদের মেয়ের নাম ভোটার তালিকায় তুলতে চান না, কারণ তাঁরা মেয়ের প্রকৃত বয়স প্রকাশ করতে চায় না। তাঁরা মনে করেন, বয়স প্রকাশিত হলে মেয়ের বিয়ের সম্ভাবনা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। ৪) অনেকে আবার মনে করেন, এই বিশাল সংখ্যক নারীদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করা থেকে বঞ্চিত করে রাখা একটি পূর্ব পরিকল্পিত রাজনৈতিক কৌশল। এই কৌশল দ্বারা ভোটদানে সক্ষম নারীদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করা থেকে জোর করে বিরত রেখে নির্বাচনী ফলাফলের ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখা হয়!

এখন সবচেয়ে দামী প্রশ্নটি হল, কী উপায়ে এই প্রতিবন্ধকতাকে অতিক্রম করা সম্ভব? অনেকেই অনেক রকম পরামর্শ দিচ্ছেন। সেই পরামর্শগুলিকে পরপর সাজিয়ে নিলে বলা যায়— প্রথমত, নির্বাচন পূর্বে নাম নিবন্ধিত না হলেও, নারীরা যদি প্রমাণপত্র দ্বারা প্রমাণ করতে পারেন তাঁদের বয়স ১৮ বছর বা তার বেশি, সেক্ষেত্রে ভোটকেন্দ্রে গিয়ে সরাসরি ভোট দেওয়ার অনুমতি দিলে সমস্যার আশু সমাধান হতে পারে। দ্বিতীয়ত, প্রতিটি নির্বাচনের আগে নির্বাচন কমিশন নির্বাচন প্রক্রিয়ায় আরও বেশি সংখ্যক নারীদের অন্তর্ভুক্ত করতে আরও বেশি কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে। তৃতীয়ত, সরকারের পক্ষ থেকে নতুন পরিকল্পনা গ্রহণ করা উচিৎ, যাতে বেশি সংখ্যক নারীরা নির্বাচনে নিজেদের মত প্রকাশের সুযোগ পান। প্রকৃতপক্ষে সর্বোত্তম উপায় নির্ধারণ করা খুবই কঠিন। গণতান্ত্রিক উদ্যোগে নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধির জন্য কোন সহজ পথ আদৌ আছে কিনা, তা নিঃসন্দেহে একটি বিতর্কিত বিষয়। কিন্তু নারীদের নিম্ন নিবন্ধন হারকে অতিক্রম করবার জন্য যে সমস্ত শুভশক্তিকে একত্র করা আশু প্রয়োজন, এ নিয়ে বিতর্কের কোন অবকাশ নেই।

ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত ভারতীয় নারীরা কিন্তু ভোটদান করতে প্রচণ্ড আগ্রহী, কিন্তু তাদের ভোটদান করবার অনুমতি নেই। এ পরিস্থিতি বড়ই উদ্বেগজনক। এই অবস্থার পেছনে অবশ্যই কিছু সামাজিক প্রতিরোধ কাজ করছে কিন্তু এর দ্বারা কখনই ভোটার তালিকায় এত বিশাল সংখ্যক নারীদের অনুপস্থিতির কারণ ব্যাখ্যা করা যায় না। এ নিয়ে আরও তদন্তের প্রয়োজন। সঠিক কারণটি তাই আজও রহস্যের চাদরে ঢাকা। তাই শেষমেশ প্রশ্নটি থেকেই যায়, স্বাধীনতার পর ৭০ বছরেরও বেশি অতিক্রান্ত, তবুও কেন ভারতের ২১ মিলিয়ন নারী ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত? এই প্রশ্নটিও ভারতের হাজারোটা সামাজিক ধাঁধার মতই একটি ধাঁধা, তাই নয় কি?

সাবিত্রী কাহিনি

শাঁওলি দে

মহাভারতের বনপর্বে 'পতিব্রতামাহাত্ম্যপর্বাধ্যায়' নামে একটি অধ্যায় আছে। সেই অধ্যায়ে আমরা সাবিত্রী ও সত্যবানের আখ্যান জানতে পারি। লখিন্দর-বেহুলা, নল-দময়ন্তীর মত সাবিত্রী-সত্যবানের কাহিনিও অত্যন্ত জনপ্রিয় ও মুখে মুখে প্রচলিত। আজও স্বামীকে সাক্ষাৎ মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচানোর গল্পে বেহুলা, দময়ন্তী ও সাবিত্রীর নাম একসঙ্গে উচ্চারিত হয় এবং দৃষ্টান্ত হিসেবে উল্লিখিত হয়।

মদ্রদেশে অশ্বপতি নামে এক ধর্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণসেবী রাজা ছিলেন। সাবিত্রী তাঁরই কন্যা। রাজা যেহেতু সাবিত্রীদেবীকে যজ্ঞে আহবান জানিয়ে কন্যালাভ করেছিলেন, তাই আদর করে কন্যার নামও রাখলেন সাবিত্রী। তেজোদীপ্তা সাবিত্রী ধীরে ধীরে যৌবনে পা রাখলে অত্যন্ত তেজের জন্য কেউই এই সুন্দরী, লক্ষ্মীমন্ত নারীকে বিয়ে করতে চাইলেন না। রাজা বিষণ্ণ হলেন। তখন তিনি নিজেই কন্যাকে ডেকে নিজেই নিজের জন্য স্বামী পছন্দ করতে বললেন।

লজ্জা পেলেও সাবিত্রী পিতার আদেশ মেনে নিলেন এবং স্বর্ণরথে চেপে পতির খোঁজে তীর্থ ভ্রমণে বের হলেন।

এই সময়ে একদিন রাজা অশ্বপতি দেবর্ষি নারদের সঙ্গে কথাবার্তায় ব্যস্ত থাকার সময়ে সাবিত্রী তীর্থ থেকে ফিরে এসে দুজনকেই প্রণাম করলেন। ঋষি নারদের প্রশ্নের উত্তরে অশ্বপতি নারদকে জানালেন সবকিছু। সাবিত্রীকে প্রশ্ন করলেন, কাকে পছন্দ হল কন্যার।

সাবিত্রী বললেন, শাল্বদেশে দ্যুমৎসেন নামে এক রাজা ছিলেন, তিনি অন্ধ হয়ে যান যখন তাঁর পুত্র নিতান্তই বালক। এই সুযোগে তাঁর রাজ্য আক্রমণ করে শত্রুরা। রাজা স্ত্রী-পুত্রসহ এক বনে আশ্রয় নেন ও ব্রত ও তপস্যা করেই দিন কাটান। তাঁর সেই বালক পুত্র এখন যুবক, নাম সত্যবান। সাবিত্রী তাঁকেই নিজের পতিরূপে বরণ করতে চান।

সাবিত্রীর কথা শুনে চমকে উঠলেন ঋষি নারদ। রাজাকে জানালেন সাবিত্রীর এ সিদ্ধান্ত একেবারেই ঠিক নয়।

রাজা ভয় পেয়ে গেলেন। তবে কি সত্যবান তাঁর নামের মত হয়ে উঠতে পারেনি? সত্যবান কি তেজস্বী, ক্ষমাবান ও শূরবীর হয়ে উঠতে পারেনি?

নারদ জানালেন, সত্যবান পিতার বীরপুত্র, সূর্যের ন্যায় তেজ তাঁর, ইন্দ্রের ন্যায় বীর, পৃথিবীর মত ক্ষমাশীল, রন্তিদেবের মত দাতা, সত্যবাদী, যযাতির মত উদার, লজ্জাশীল, জিতেন্দ্রীয় ও ঈর্ষাহীন। এই কথা শুনে রাজা অশ্বপতি সত্যিই অবাক হলেন, এমন সর্বগুণসম্পন্ন পুরুষকে তবে কীসের জন্য বিয়ের উপযুক্ত মনে করছেন না নারদ। নারদ জানালেন যে, সত্যিই এই পুরুষ সর্বগুণসম্পন্ন, শুধু দোষের মধ্যে একটাই দোষ আজ থেকে ঠিক এক বছর পর মৃত্যু হবে এই বীরপুরুষের।

রাজা ভয় পেলেন, সাবিত্রীকে ডেকে এই বিয়ের সংকল্প ত্যাগ করতে বললেন। কিন্তু সাবিত্রী নাছোড়,

একবার যাকে স্বামীরূপে বরণ করেছে সাবিত্রী সেটা আর কখনওই ফিরিয়ে নেওয়া যাবে না। সাবিত্রীর এই দৃঢ় মনোভাবে পিছিয়ে আসলেন পিতা। স্থির করলেন সত্যবানের সঙ্গেই হবে তাঁর কন্যার বিবাহ, ভাগ্যে যা আছে তাই হবে।

এরপর রাজা অশ্বপতি বনে গিয়ে সত্যবানের পিতা দ্যুমৎসেনের কাছে গিয়ে কন্যার বিয়ের প্রস্তাব দিলেন। জানতে পারলেন তাঁরও ইচ্ছে ছিল এই বিয়ে দেওয়ার, কিন্তু রাজ্যচ্যুত হওয়ায় সে চিন্তা আর মাথায় আনেন নি দ্যুমৎসেন। অবশেষে সকলের সম্মতিতে সাবিত্রীর সঙ্গে সত্যবানের বিবাহ সম্পন্ন হল। সাবিত্রী ও সত্যবান দুজন দুজনকে পেয়েই খুশি হলেন। বিয়ের পর সাবিত্রী নিজের সব গয়নাগাঁটি খুলে গেরুয়া বসন ধারণ করলেন। মধুর বাক্য, সেবা, বিনয় ও সংযম দিয়ে শ্বশুর শাশুড়ি ও পতিকে সন্তুষ্ট করলেন।

যত দিন যেতে লাগল সত্যবানের মৃত্যুর দিনও ঘনিয়ে আসতে লাগল। নারদের কথামত সত্যবানের মৃত্যুর যখন আর মাত্র চারদিন বাকি, কঠোর উপবাস ও ব্রত শুরু করলেন সাবিত্রী। এভাবে দিন কাটল। যেদিন সত্যবানের মারা যাওয়ার দিন, সত্যবান বনে কাঠ সংগ্রহের জন্য রওনা হতে চাইলেন। বুক কেঁপে উঠল সাবিত্রীর। জেদ ধরলেন তিনিও যাবেন তাঁর স্বামীর সঙ্গে। সত্যবান বললেন, 'তোমার যদি যাওয়াতে উৎসাহ থাকে, তাহলে আমার সঙ্গে চল, কিন্তু আগে মাতা পিতার অনুমতি নিয়ে এস।' সাবিত্রী তাই করলেন এবং রওনা হলেন স্বামীর সঙ্গে।

গভীর জঙ্গলে কাঠ কাটতে কাটতে শ্রান্ত, ক্লান্ত হয়ে পড়লেন সত্যবান। গা ঘেমে উঠল। মাথা ব্যথায় কাতর হয়ে পড়লেন। সমস্ত শরীর জ্বালা করে উঠল। কথা বলতে বলতেই সত্যবান সাবিত্রীর কোলে ঢলে পড়লেন। সাবিত্রী বুঝে গেলেন সত্য হতে চলেছে ঋষি নারদের সব কথা।

সেই মুহূর্তে সেখানে লাল রঙের পোশাক ও মাথায় মুকুট পরা, তেজস্বী এক পুরুষকে দেখা গেল। তিনি সুন্দর অথচ ভয়ংকর। সাবিত্রী বুঝলেন স্বয়ং যমরাজ এসে উপস্থিত। তিনি স্বামীর মাথা কোল থেকে নামিয়ে যমরাজকে জিজ্ঞেস করলেন, এখানে তাঁর আসার কারণ কী?

যমরাজ জানালেন, যেহেতু সত্যবান ধর্মাত্মা ও গুণী তাই তিনি এই শেষ সময়ে নিজেই ওঁকে নিতে এসেছেন।

সেই মুহূর্তে সত্যবানের নিথর শরীর থেকে এক জীব বেরিয়ে আসলে তাঁকে নিয়ে যমরাজ দক্ষিণ দিকে যাত্রা শুরু করলেন। সেই দেখে সাবিত্রীও তাদের পিছু নিল।

যমরাজ সাবিত্রীকে ফিরে যেতে বললেন, কারণ জীবিত স্বামীর সেবার ঋণ থেকে সে এখন মুক্ত। অতএব এখন ওর ফিরেই যাওয়া উচিৎ।

সাবিত্রী উত্তর দেয় যে সে স্বামী যেখানে যাবে সেখানেই যাবে, কোথাও তাঁর গতি রুদ্ধ হবে না। সাবিত্রীর কথা শুনে প্রীত হন যমরাজ, তিনি বর দেন, স্বামী সত্যবান ছাড়া আর যে কোনও বর প্রার্থনা করতে। সাবিত্রী তখন তাঁর শ্বশুর মশাইয়ের চোখ ফিরে পাওয়ার বর চান। যমরাজ রাজী হন। তবু পিছু হটে না সাবিত্রী। যমরাজকে কথায় তুষ্ট করে একইভাবে শ্বশুরের রাজ্য ও তারপর শ্বশুরের শতপুত্রের প্রার্থনা করেন। যমরাজ রাজী হন এইবারেও। সব পেয়েও যমরাজের পিছু ছাড়ে না সাবিত্রী। আরও দূর পথ অতিক্রম করতে থাকে, যমরাজ তখন আবারও সত্যবানের জীবন ছাড়া আর যে কোনও বর চাওয়ার অনুরোধ করেন।

সাবিত্রী তখন বলে ওঠে, সত্যবানের দ্বারা যেন সাবিত্রী শতপুত্র লাভ করে, যমরাজ বলে ওঠেন, তথাস্তু।

এরপরও যখন সাবিত্রী চলতে থাকে, যমরাজ সত্যিই অবাক হন। এমন ধৈর্যশীলা, বুদ্ধিমতি, পতিব্রতা রমণীর প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা বেড়ে যায় অনেকটাই। অবশেষে তিনি সাবিত্রীকে একটি অনুপম বর চাওয়ার কথা বলেন। সাবিত্রী এবার বলে ওঠে, যে শতপুত্রের বর যমরাজ দিয়েছেন তা কি সত্যবানের সঙ্গে দাম্পত্য-ধর্ম ছাড়া সম্ভব? সুতরাং নিজের কথা রক্ষার জন্যই যেন যমরাজ এবার সত্যবানের জীবন ফিরিয়ে দেওয়ার বর দেন। যমরাজ অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে ওঠেন এবং বলেন, 'তবে তাই হোক।' যমরাজ এরপর সত্যবানকে মুক্তি দেন, চারশো বছর নীরোগ থাকার ও যশস্বীর হওয়ার আশীর্বাদ করেন। এইভাবে যমরাজকে তুষ্ট করে সাবিত্রী মৃত্যুর মুখ থেকে নয়, সাক্ষাৎ মৃত্যুর পরই ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হয়।

এমন পতিব্রতা রমণীর গল্প এই যুগেও লোকের মুখে মুখে ফেরে, এইখানেই সাবিত্রীর কাহিনি সার্থকনামা হয়ে ওঠে।

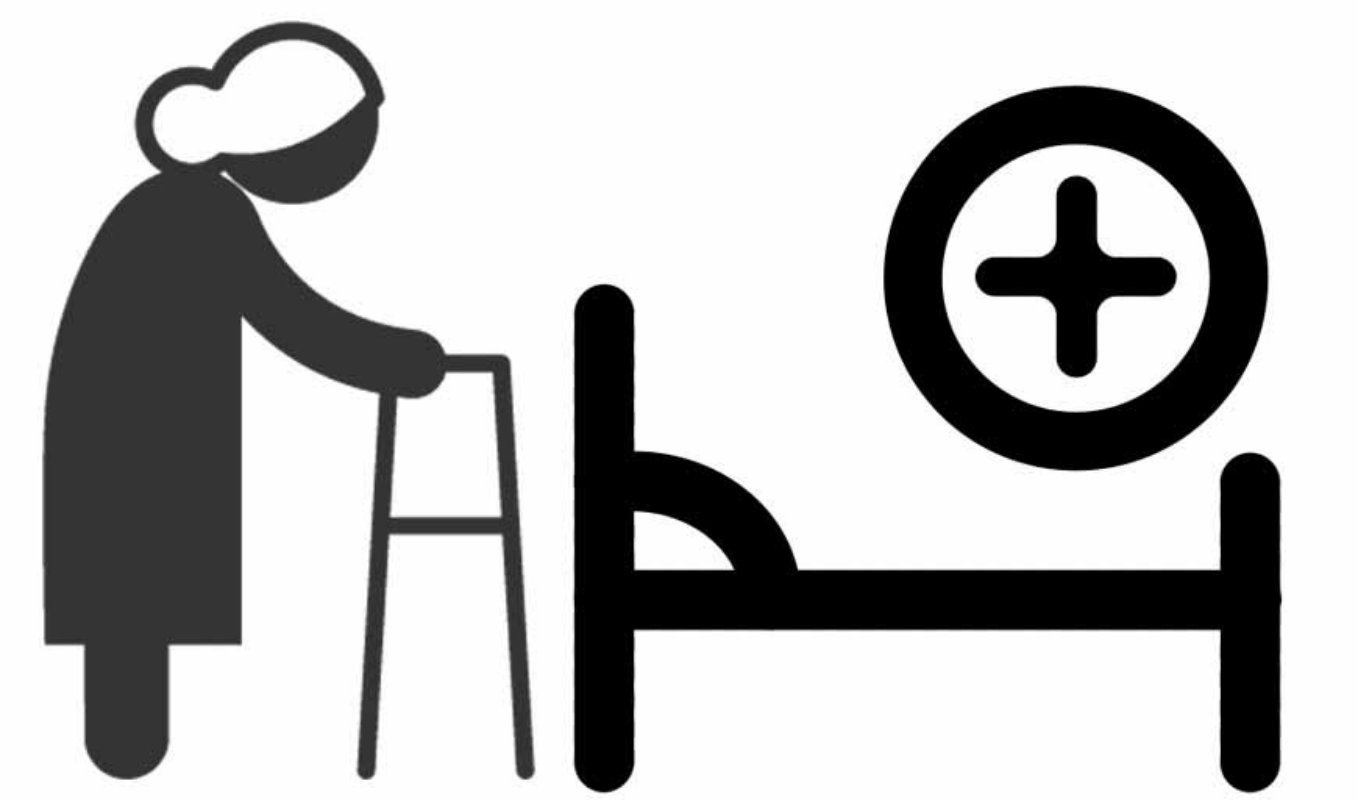

ফিমেল সার্জিকাল ওয়ার্ড

তনুশ্রী পাল

সন্ধে সোয়া ছ'টা থেকে যা চলেছে উফফ... যেন একটা সুনামির তান্ডব। ঘটনার আকস্মিকতায় হতভম্ব আর ঘটনা প্রবাহের প্রবল টানে ছোটা। এখন সাড়ে আটটা। মাকে বেডে দিয়েছে আর রক্তও বন্ধ হয়েছে। তবু বারবার মায়ের মাথার নীচে হাতটা আপনাআপনি চলে যাচ্ছিল, ভিজে ওঠেনি তো আবার! দু দুবার সেলাই পড়েছে আর প্রচুর ব্লিডিং হয়েছে! মনে হচ্ছিল রক্ত বুঝি বন্ধই করতে পারবে না এরা! আসলে বিপর্যয় মোকাবিলার প্রস্তুতি নিয়ে কে আর বসে থাকে? ছিলামও না, ঘটনার আকস্মিকতায় বিহ্বল হয়ে পড়েছিলাম প্রথমে! ঘোর সন্ধেবেলায় মা পড়ে গেলেন বাথরুমে; তার আগের মুহূর্তে চা খেতে খেতে টিভি দেখছিলেন। আমাদের সঙ্গে গল্প করছিলেন। ডানভুরুর ওপর বেশ খানিকটা কেটে একেবারে হাঁ হয়ে আছে, প্রথমে সেটাই চোখে পড়েছিল। পরে দেখা গেল দরজার কোনায় লেগে মাথার চাঁদিতেও অনেকটা কেটেছে। রক্ত একেবারে ঝরঝরিয়ে পড়ছিল! তারপর এই ছোটাছুটি, এ্যাম্বুলেন্স হাসপাতাল এমারজেন্সিতে দেখিয়ে ওটি। এই বয়সে মায়ের শরীরের অর্ধেক রক্তই মনে হয় বেরিয়ে গেল! তায় সজ্ঞানেই মাথায় অতগুলো সেলাই; উফ চোখে দেখা যায় না। খুব কষ্ট পেলেন। সিটি স্ক্যান করিয়ে বেডে দেওয়া হোল। পরপর ইঞ্জেকশন, স্যালাইন। একটু আচ্ছন্নভাব, মাঝেমাঝেই উঃ আঃ।

ফিমেল ওয়ার্ড, মহিলারাই থাকতে পারবে। খানিকবাদে বাড়ির ছেলেদের বাইরে ওয়েটিং রুমে যেতে বলল সিস্টার। বসে রইলাম বেডের পাশের এ্যালুমিনিয়ামের ছোট টুলে। মাথায় বিরাট ব্যান্ডেজ, মা শুয়ে আছে। চুপ করে বসে এতক্ষণে টানটান স্নায়ুগুলো যেন খানিক বিরাম পায় আর চারপাশের লোকজন সম্পর্কে খানিক সচেতন হয়ে উঠি। হ্যাঁ মাকে স্ট্রেচার থেকে নামানোর সময় হলদেটে শাড়ি পরা পাতলা ঢ্যাঙা চেহারার এক মহিলা আরও দুজন মহিলা সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল। স্ট্রেচার থেকে মায়ের ভারি শরীর বেডে নামাতে আমাদের খুব কষ্ট হচ্ছিল তায় মাথার সেলাই যদি আবার ছিঁড়ে যায় সে আতংকও ছিল। পাতলা চেহারার ওয়ার্ড গার্লও কেমন হাল্কা হাতেই ধরে খালি উপদেশ দিয়ে গেল। ওই মহিলাদের সাহায্যেই আমরা মাকে বেডে নামাতে পেরেছিলাম।

ওপাশের বেডে স্যালোয়ার কামিজ পরা কম বয়সী মেয়ে শুয়ে, আর সেই হলুদশাড়ি পাশের টুলে। ওনার দিকে তাকিয়ে হাসলাম, উনিও। জিজ্ঞেস করলেন চোখের ইঙ্গিতে মাকে দেখিয়ে, 'কে?' বললাম, 'মা।' বেডে শোয়া মেয়েটির দিকে ইঙ্গিত করে জিজ্ঞেস করলাম, 'মেয়ে নাকি, কী হয়েছে?' উনি হাতের কেমন এক ভঙ্গি করে বলেন, 'না দাদার বেটি। উয়ার স্বামীটাই মাইচ্চে। সারা দেহাত খিব ব্যাথা। স্যালাইন ছিল বিকালে খুলি দিসে।' বেডগুলোর মাঝে হাত চারেকের দূরত্ব, আদৌ ঘেঁষাঘেঁষি নয়। চাপা স্বরে আর খানিকটা সাংকেতিক কথা চলে আমাদের। দু'-চারটে বাদে চারদিকের সব বেডই প্রায় ভর্তি। সাদা স্কার্টের সিস্টাররা আসা যাওয়া করছে। আয়া রাখা যাবে না, বাড়ির লোককেই থাকতে হবে। নতুন সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল। মূল শহর থেকে বেশ খানিকটা দূরে। বেশ ঝকঝকে। সিকিউরিটির মহিলারাও ঘুরে বেড়াচ্ছে। বেডের নীচে ময়লা দেখে এক মহিলাকে বেশ কড়া ধমক লাগালেন। প্লাগ পয়েন্টে মোবাইল চার্জ হতে দেখে ধমক মেরে খুলে দিলেন।

রাত অনেকটা হল। এরপরে শহরে ফেরার টোটো বা অন্য কোনও যানবাহন পাওয়া যাবে না। শান্তনু আর বিটুকে বাড়ি যেতে বললাম। মা ঘুমোচ্ছেন, সবাই মিলে রাত জাগার দরকার নেই। তেমন সমস্যা হলে ফোন করব। খাবার কিনে দিতে চাইল ওরা কিন্তু খেতে ইচ্ছেই করল না। এত রক্ত, ব্যান্ডেজ, স্যালাইন, ইঞ্জেকশন সব মিলিয়ে কেমন এক অলিখিত এমারজেন্সি। খাওয়ার ইচ্ছেটাই চলে গেছে। মাকে আজ কোনও খাবার দেওয়া যাবে না, ওটিতে একবার বমি হয়েছিল। বিস্কিটের প্যাকেট আর জলের বোতল কিনে দিয়ে ওরা বাড়ি গেল।

পেশেন্টরা সবাই রাতের খাবার খেয়ে নিচ্ছিল। হলুদশাড়ি আমায় কিছু খেয়ে নিতে বলে। তার কাছে মুড়ি আর বিস্কুট আছে, খাবার জন্য সাধে। অনিচ্ছা জানাতেই বলে বসেন 'কেনে মোচলমানের থাকি খান না তোমরা?' 'কী বলেন দিদি ছিঃ, এসব কথা বলতে হয় না। হাসপাতালে, অসুখে আবার হিন্দু-মুসলমান? সবাই বিপদে পড়েই না এখানে। খাবার ইচ্ছা নাই গো। আমার কাছে বিস্কিট আছে তো।' 'ঘুম তো হবে না, খাওয়াও নাই। কালি চলিবার পারিবেন? তাতে পেশেন্ট আসে, উয়ার টেনসন আসে। হয় কি না হয়।' উনি জোর করেই দুটো বিস্কুট দেন। অগত্যা বিস্কুট আর জল খেলাম। খুব মায়া আর ভারি কেয়ারিং মহিলা। গ্রামের মানুষ, যথেষ্ট স্মার্টও। সিস্টার এসে মায়ের নতুন স্যালাইনের বোতল লাগিয়ে বলল, 'আটঘন্টা চলবে এটা। শেষ হবে কাল সকালে।' ডানধারের বেডের মহিলাও ওনার মাকে নিয়ে আছেন। দিন তিনেক আগে রাস্তার ধার দিয়েই হেঁটে যাচ্ছিলেন হঠাৎ মোটর বাইক এসে ধাক্কা মেরেছে, পাঁজরের দুটো হাড় ভেঙেছে, মাথাও ফেটেছে। কী দুর্ভোগ বয়স্ক মানুষটির। চারদিকে তাকিয়ে নিজেদের কষ্ট খানিক হাল্কা মনে হয়। ফিমেল সার্জিকাল ওয়ার্ড, এখানে এত এত আহত মহিলা!

প্যাসেজের আলো জ্বলছে, পেশেন্টরা আর তাদের বাড়ির লোকেরা একে একে শুয়ে পড়ছে, আলো নিভে যাচ্ছে। নিজেদের পেশেন্টের বেডেই একধারে শুয়ে পড়ল কেউ কেউ। অনেকে দু একটা যা ফাঁকা বেড ছিল সেখানে গিয়ে গা এলিয়ে দিল। আমি ঠায় বসে, শুয়ে পড়তে পারলে ভাল হত কিন্তু একদিকে স্যালাইনের স্ট্যান্ড আর মা ভারি শরীরের মানুষ জায়গা অকুলান। পাশের বেডের মহিলা তার মায়ের পায়ের দিকে মাথা রেখেই শুয়েছেন। আমায় বলেন 'মায়ের পায়ের দিকে মাথা রেখে একটু শুয়ে নিন।' মাথা নাড়িয়ে সম্মতি জানাই, খানিক পরে দুপাশের দুসারি বেডের মাঝখান দিয়ে খানিক হাঁটি। মায়ের পাশে শোয়ার চেষ্টা করি বেকেচুরে অষ্টাবক্রমুনি হয়ে। বেশিক্ষণ ওভাবে থাকা যাচ্ছে না। ঘরে আর করিডোরে খানিক পায়চারি করি।

রাত একটা, সিস্টাররা নিজেদের মধ্যে চাপা স্বরে গল্প করছে মোবাইল ঘাঁটছে। সবই কম বয়সের ট্রেনি নার্স মনে হয়। সিনিয়র নার্স মহিলা কোথায় যেন গেলেন। পরপর দুটো স্ট্রেচারে দুজন পেশেন্ট ঢুকল, সঙ্গে বাড়ির লোকজন। বেড রেডি করে স্যালাইন ইঞ্জেকশন সব দিয়ে তাদের বেডে দিয়ে দিল। দুজনের মাথায় ব্যান্ডেজ; এত মানুষের একই দিনে মাথা ফেটেছে! কী করে? নাকি রোজই এমন ধারার কান্ড হয়, রোগিণীরা ভর্তি হয়, বাইরের জগত জানতে পারে না। হাত, পা, মাথা, ঘাড়ে চোট কাটা ফাটা নিয়ে বহুসংখ্যক মহিলারা আসেন বলেই না একটা আস্ত ফিমেল সার্জিকাল ওয়ার্ড বানানো হয়েছে। রাত দুটোর পর আর নতুন কোনও রোগী এল না। কমবয়সী সিস্টার তিনজন দুটো ফাঁকা বেড জোড়া লাগিয়ে শুয়ে পড়ল। ফিমেল ওয়ার্ডের দরজা বন্ধ করে ভেতরে দুপাশে সিকিউরিটি আর ওয়ার্ড গার্ল দুই মহিলা স্টিলের লম্বা চেয়ারগুলোর ওপর চাদর ঢাকা দিয়ে শুয়ে পড়েছে। আমি আবার মায়ের বেডে মাথা রেখে ঘুমনোর চেষ্টা করি। মা মাঝে মাঝে উঃ আঃ করেন; এপাশ ওপাশ করেন। স্যালাইনের চ্যানেলটা ঠিক রাখার জন্যে মাকে আবার সোজা করে শুইয়ে দিই। প্রহরের পর প্রহর পেরিয়ে যায়। সত্যি মানুষ কত অসহায়, দু'মিনিট পরে কী ঘটতে যাচ্ছে জানি না; যে শরীর নিজের বলে দাবি করি সে শরীরের যন্ত্রপাতি সম্বন্ধেও পরিষ্কার ধারণা নেই!

ভোর ভোর ঠান্ডা হাওয়া দিচ্ছে। গতকাল ওই অবস্থায় গায়ের চাদর টাদর আনবার কথা মনেই পড়েনি। কাচের জানালার ওপাশে একটু একটু করে আলো ফুটছে। হাল্কা কুয়াশা মাখা সবজে আভা, জানালার ধারে গিয়ে বাইরে তাকাই। পাঁচতলার ওপর থেকে নীচের সবকিছুই ছোট দেখাচ্ছে। রুগ্ন একটা নদীখাত এঁকেবেকে সারিবদ্ধ বাঁশবনের ভেতর দিয়ে কোথায়

পরপর দুটো স্ট্রেচারে দুজন পেশেন্ট ঢুকল, সঙ্গে বাড়ির লোকজন। বেড রেডি করে স্যালাইন ইঞ্জেকশন সব দিয়ে তাদের বেডে দিয়ে দিল। দুজনের মাথায় ব্যান্ডেজ; এত মানুষের একই দিনে মাথা ফেটেছে! কি করে? নাকি রোজই এমন ধারার কান্ড হয়, রোগিণীরা ভর্তি হয়, বাইরের জগত জানতে পারে না। হাত, পা, মাথা, ঘাড়ে চোট কাটা ফাটা নিয়ে বহুসংখ্যক মহিলারা আসেন বলেই না একটা আস্ত ফিমেল সার্জিকাল ওয়ার্ড বানানো হয়েছে। রাত দুটোর পর আর নতুন কোনও রোগী এল না।

উধাও হয়েছে! একদিন জল ছিল, স্রোত ছিল আজ চিহ্নমাত্র সার। অনুমানে বুঝে নেওয়া। মানুষের জীবনের মতই যেন! কত সম্ভাবনায়, স্বপ্নে শুরু হয় জীবনের নতুন নতুন পর্ব... তারপর মেলে কি আর সব হিসেব? অপূর্ব দেহসৌষ্ঠব, উজ্জ্বল ত্বক, ঝকঝকে চোখ, কত অনুরাগী; চাওয়াপাওয়া, উচ্চাশা, অর্জন, গর্ব সব কোথায় যে মিলিয়ে যায়। নিজ বংশের পরবর্তী কয়েক প্রজন্মের মধ্যেই হারিয়ে যায় মানুষটির নাম ও নিশান। এটাই তো সত্যি। বলতে পারব কি আমি ঠাকুমার মায়ের নাম তার মায়ের নাম তার মায়ের নাম? কিন্তু তাঁরা তো ছিলেন, হেসে কেঁদে কাটিয়ে গেছেন জীবন, এই পৃথিবীর মাটিতেই। জীবনটা যেন বিরাট এক হাসপাতালের বেডে সারসার পাশাপাশি শুয়ে বসে হেসে কেঁদে কাটিয়ে দেওয়া। গায়ের ওপরের কম্বলের রং শুধু পাল্টে যায় এই লাল, নীল, হলুদ, সবুজ, কালো! যার যখন টার্ম আসবে বেড ফাঁকা করে দিয়ে চলে যাও।

একজন দুজন করে জেগে উঠছে পেশেন্টরা তাদের সঙ্গের লোকজন। জানালার পাশের বেডে একেবারেই অল্পবয়সী একটি খুব রোগা বউ, ফুঁপিয়ে কাঁদছে নাকি! একজন মহিলাও পাশে শুয়ে, হয়ত মা। সরে আসি সেখান থেকে। সুইপার দিদিরা ঢুকে পড়েছে। বাথরুম ঘুরে আসি, মাকে ইউরিনাল দিই। সিস্টাররা এসে নাম ডেকে ডেকে পেশেন্টদের ওষুধ ইঞ্জেকশন দিতে শুরু করলেন। আরেকটি দিনের পুরো কর্মযজ্ঞ শুরু হয়েছে ফিমেল সার্জিকাল ওয়ার্ডে। সিস্টারকে জিজ্ঞেস করে জলে ভিজিয়ে মাকে দুটো বিস্কিট খাইয়ে দিই। ডিম সেদ্ধ, কলা, ব্রেড আর একগ্লাস করে দুধ সকালের ব্রেকফাস্ট এসে পড়ল হাসপাতালের তরফ থেকে। গ্লাস, বাটি নিয়ে ব্যস্ততা রোগীর সঙ্গের মা মাসীদের মধ্যে। ক'জন মহিলা গ্লাস হাতে নীচে যাচ্ছে চা খেতে, আমাকেও ডাকে তারা, বলি 'পরে যাব, বাড়ির কেউ আসুক তখন।'

'ডাক্তারবাবু কখন আসবেন রাউন্ডে, গতকালের সিটিস্ক্যানের রিপোর্ট দেখাতে হবে।' সিস্টার জানান, 'কখন আসবেন বলতে পারছি না, ওনার ওটি আছে, মেলা পেশেন্ট। সেসব শেষ করে আসবেন। দুপুরেও আসতে পারেন, বিকেলেও আসতে পারেন, রাতও হতে পারে।' ভাবি অদ্ভুত ব্যাপার তো! মা ডান কাত হয়েই পড়ে গিয়েছিলেন। ডানদিকের গালে, কানের পাশে কেমন কালশিটে মত পড়েছে। বেশিটা সময় ঝিমুনি ভাব, কথাও বলছেন। তবে কিছু কিছু কথা খানিক অসংলগ্ন মনে হল। এ বয়সে এত ব্যথা, এত রক্তপাত! ডাক্তারকে সিটি স্ক্যান রিপোর্টটা না দেখানো অব্দি শান্তি পাচ্ছি না। মাকে হাল্কা খাবার দেওয়া যাবে জানালেন সিস্টার। বাড়ি থেকে সব ব্যবস্থা করে নিয়ে আসতে হবে, এসবই ভাবছিলাম।

হলুদ শাড়ির সঙ্গে আরেক মহিলার কথাবার্তায় কান গেল। হলুদ শাড়ির ভাইঝি কাল থেকেই দেখেছি চুপচাপ শুয়ে আছে, কথাই বলে না। আমার সঙ্গেও বারকয়েক চোখাচোখি হয়েছে মেয়েটার। ওর পিসি অন্য মহিলাটিকে হাত পা নেড়ে বলে, 'মা বাপ নাই আমরা তাই বিয়া দিছি ছোটতে মেয়েটাকে। ভাল করি খাবে পরবে, হাসিখেলি থাকিবে তা কিছুই তো হইল না, সতের বছর হইচে এখন মাইটার। তিনবছরের একটা ছাওয়া আছে। তা এমন যে মাচ্চে মেয়েটাক সারা শরীলে নীল নীল দাগ হয়া গেচে। ওইদিন সকালে তো সগায় নিজের নিজের কামকাজ কচ্চে; বেটা ছাওয়া কাহই বাড়িত নাই। তেখন মোটর সাইকলত মেয়েটাক পিঠের সাতে ওড়না দিয়া বান্দি আনচে আর দুয়ারের গোড়ত বস্তার মত ধিপিস করি ফেলি দিয়া চম্পট। এমন শয়তান জামাইটা। মেয়েটার জ্ঞান নাই, তখন হাসপাতালে আনলাম। এখন একটু ভাল হইচে।'

'শ্বশুরবাড়িতে আবার পাঠাবেন নাকি মেয়েকে? এবারে গেলে তো মেরেই ফেলবে। ডিভোর্স করান, সরকারের মেলা ট্রেনিং আছে মেয়েদের জন্য সেগুলো শিখুক। নিজে কামাই করে নিজের পায়ে দাঁড়াক। আজকাল এত মার খেয়ে শ্বশুরবাড়িতে থাকে নাকি মেয়েরা?' বলে বসি ওনাদের কথার মাঝে। 'আমরা তো চাই না ওইখানে যাউক। পরে অন্যখানে নিকা দিব। কিন্তু মাইটা যাবার চায় শ্বশুরবাড়ি। বলতেসে বর যদি নিবার আসে তাইলে আবার যাবে। পুলিশেও যাবার দিল না।' 'কী আশ্চর্য! পাগল নাকি মেয়েটা? কেন আবার যেতে চায় ওখানে? মেরে হাসপাতালে পাঠিয়ে দিয়েছে তাও শিক্ষা হয়নি, এ কেমন মেয়ে?' ওর পিসি বলে, 'বাচ্চাটা আছে না, ওইবাদেই আবার যাইতে চায়। বরটা নিতে আসলে যাবে বলতেচে।' মেয়েটা চুপ করে সব কথাই শুনছিল, খটখটে চোখে তাকিয়ে ছিল মেঝের দিকে।

ভিজিটর্স আওয়ারসে বড়দা এল। ওকে সব বুঝিয়ে,

মায়ের কাছে বসিয়ে বেরিয়ে আসি। মায়ের জামাকাপড়, খাবার, আরও সব টুকটাক জিনিসপত্র শান্তনু বা বিটুকে দিয়ে পাঠাতে হবে। নিজেও স্নান খাওয়া করে, খানিক বিশ্রাম নিয়েই আসব নইলে রাত জাগা কঠিন। দুপুরের খাবার নিয়ে গেল শান্তনু। বেলা তিনটে নাগাদ ফের হসপিটাল পৌঁছে ওদের ছেড়ে দিলাম। স্যালাইন খুলে নিয়েছে মায়ের। ডাক্তার কখন আসবেন, জিজ্ঞেস করায় সিস্টারের সেই একই উত্তর, 'আসবেন। কিন্তু কখন বলতে পারছি না।' মা ঘুমিয়ে পড়েছে আবার। হলুদ শাড়ির বেডটা ফাঁকা। ওরা চলে গেছে।

খানিক বাদেই স্ট্রেচারে নতুন পেশেন্ট। মাথায়, দুহাতে ব্যান্ডেজ, মহিলাটিকে ওই বেডেই দিল। উদবিগ্ন পরিজনেরা ঘিরে আছে। যে ডাক্তার রাউন্ডে ছিলেন তিনিই এলেন, দুজন সিস্টারও। কোঁকড়া চুলের কালো পাতলা চেহারার মহিলাটিকে ডাক্তার সরাসরি প্রশ্ন করলেন, 'হ্যাঁ বল কী নিয়ে মারামারি। তুমিও মেরেছ নাকি খালি মার খেয়েছ?' ডাক্তারের প্রশ্ন শুনে বিরক্ত হই; কী করে উনি জানলেন যে মারপিট হয়েছে? পাশের থেকে একটি লোক উত্তর দিতেই ডাক্তারবাবু বলেন, 'না, তোমরা কেউ কিছু বলবে না। ওর মুখ থেকেই শুনব।' আহত মহিলাটি খানিক হাঁপিয়ে মৃদুস্বরে বলতে থাকে, স্পষ্ট শুনতে পাই না। ডাক্তার সব শুনে চলে যান, ডাক্তারের পেছনে পেছনে বছর কুড়ি একুশের একটি ছেলে আর একজন মহিলাও যান। রোগিনীর পাশে দাঁড়ান লোকটিকে জিজ্ঞেস করি, 'কে হয় উনি? কী ব্যাপার?' বলেন, 'আমার বড় বইন। জামাইয়ে মাইরা মাথা ফাটাইসে' ক্ষোভ উগরে দেয় মানুষটি 'পুলিশে যামু আমরা। মাইরাই ফালাইত, দিদিয়ে দুইহাত দিয়া ঠেকাইসে। হাত ভাইঙ্গা গেসে, দেখসেন কী পাষন্ড একটা। পোলাপান সব বড় হয়া গেসে। তারে সন্দেহ করে! আমি তো ছাড়ুম না।' 'তা আপনারা কোথায় ছিলেন? ছেলেমেয়েরা আটকাতে পারেনি? কথায় কথায় মেয়েদের গায়ে হাত তোলা, কী ধরণের ব্যাপার এসব? অবশ্যই পুলিশে কমপ্লেইন করা দরকার।' এ সময় তরুণটি এসে বলে, 'মারে অহন সিটি স্ক্যান করায়ে আনতে হবে মামা, ডাক্তার কইল।' খানিকবাদেই স্ট্রেচারে তুলে ওরা মহিলাকে নিয়ে গেল। অভিজ্ঞ ডাক্তার চোট দেখেই বুঝেছেন মারামারির কেস!

আমাদের ডাক্তার রাউন্ডে এলেন। মায়ের সিটি স্ক্যানের রিপোর্ট দেখে জানালেন, 'ভগবানকে ধন্যবাদ দিন, স্কালে কোনও ইনজুরি নেই, কোথাও ফাটেনি। হলেই মুস্কিল হয়ে যেত। তিন জায়গায় কেটে গিয়েই এত রক্ত পড়েছে। আজ রেখে কাল ছুটি দিয়ে দেব। তবে নিয়মিত ড্রেসিং করাতে হবে। জলটল কিন্তু লাগান যাবে না। দুর্বলতা থাকবে; ওষুধগুলো আর প্রোটিন পাউডার লিখে দিলাম। নিয়মিত খেতে হবে।' যাক তেমন ভয়ের কিছু নেই 'ডাক্তারবাবু মাকে ব্লাড-টলাড দিতে হবে না? এত যে ব্লাড চলে গেল শরীর থেকে।' 'না দরকার হবে না। ড্রেসিং করিয়ে নেবেন, লিখে দিয়েছি।' পরের পেশেন্টের বাড়ির লোকের সঙ্গে কথা বলতে শুরু করেন ডাক্তার। মা ঘুমুচ্ছে, খানিক হাল্কা মনেই আশপাশের সবাইকে লক্ষ্য করি। মোট পঁচিশটা বেডের দুটো মাত্র বেড ফাঁকা।

তিনশ বাইশ নাম্বার বেড মায়ের। হাতে, পায়ে, মাথায় ব্যান্ডেজ বাঁধা সারসার মহিলা। কাল খুব কথা বলছিল লাল শাড়ি পরা বউটি, ওর বেডের কাছে গিয়ে আলাপ করি। বাঁ পায়ের বুড়ো আঙ্গুল ভেঙে নখ উপড়ে গেছে। পায়ের পাতায় আঙুলসুদ্ধ ব্যান্ডেজ খানিক আগেই ড্রেসিং করিয়ে এনেছে ওর মা। পায়ের পাতা ফুলে আছে! 'বাড়ি থেকে আর কেউ আসেনি? মা ছোটাছুটি করছেন দেখছি। কী করে এমন ব্যথা পেলে?' 'জমিতে কোদালের চোট খাইসি তাতেই এই অবস্থা হইচে। কে আসবে, বাবা দাদা সবার কাজ, জমির কাজ মেলা আর স্বামী ত নাই মারা গেসে কতবে' 'ও তোমার বিয়ে হয়েছে বোঝাই যায় না। এত অল্পবয়সে স্বামী মারা গেছে? কীভাবে মারা গেল?' হাসিখুশি মেয়েটি বলে, 'বাইক এক্সিডেন্টে দিদি। বিয়া হইসিল পনের বছরে। আমাদের গ্রামের দিকে তো ছোটতেই বিয়া দেয়। আমার মেয়ে এইবার মাধ্যমিক দিল।' 'তাই, বাঃ দারুণ ব্যাপার। তা তুমি আবার বিয়েটিয়ে করে নিলে পারতে। একা একা থাকবে সারাজীবন? জমিতে কাজ কর? দারুণ মেয়ে তুমি! এত ব্যথা পেয়েও হাসছ গল্প করছ!' 'দিদি জমি তো আমার। বাবায় পাঁচবিঘা জমি দিসে তো নিজেও খাটি, দিন হাজিরা লেবার নিই। সম্বন্ধ আসে মেলা কিন্তু আমার বিয়ায় মন নাই। মেয়েটাকে

নাঃ আর কারুর কাছে তাদের চোটের কারণ জানতে চাইব না। বেশিরভাগই নিম্নবিত্ত পরিবারের খেটে খাওয়া মহিলা। ঘরেবাইরে পরিশ্রম করে সংসারের জন্যই, তারপরেও! আর এই বাইরের চোট, ব্যান্ডেজ, স্যালাইন, প্লাস্টার সব দেখা যাচ্ছে কিন্তু ভেতরে বুকের মধ্যে? মার খাওয়া, অপমানিত হওয়া মহিলাগুলোর বুকের ভেতর কী হচ্ছে? আবার সুস্থ হয়ে ফিরবে সংসারে? ভরসা, বিশ্বাস, প্রেম, যত্ন, সেবা কত কী চায় সংসার সমাজ মেয়েদের কাছে! হায়রে ভারতবর্ষ, হায়রে আমার বাংলা! হায়রে এত সেমিনার মিটিং মিছিল; উওমেন এমপাওয়ারমেন্টের জিগির। ঠিকঠাক পৌঁচ্ছচ্ছে কোথায় আলোর বার্তা?

পড়াব, যতদূর পইড়বে। ব্যাস, বিয়া করব না।' কাল ভাবছিলাম বড্ড লাউড আর বেশি কথা বলে মহিলাটি, আজ স্বাধীনচেতা পরিশ্রমী মেয়েটিকে মনে মনে ডাকলাম ক্যাপটেন।

ওর পাশের বেডের শান্তি মণ্ডল এসে গল্পে যোগ দিল। মহিলা বড্ড রোগা। ওনার অপারেশন হবে কাল। এপেন্ডিক্স না হার্নিয়া না গলব্লাডার সঠিক বলতে পারলেন না। রোগা পেটের ওপর হাত বুলিয়ে দেখালেন সারাটা পেটেই খুব ব্যথা। 'অপারেশন হবে বাড়ির লোক আসবে তো? কাউকে দেখছি না।' 'বাড়িতে কেউ নাই, দুই পোলাই কাজে গেসে কেরালায়। স্বামী আছে কিন্তু হ্যায় আইব ক্যামনে। নয়টা গরু আসে গো দিদি, বাচুর আসে পাঁচটা। মেলা খাটনি করবার নাগে। ভাল জিনিস খাওয়াইতে হয় গরু-বাচুররে। উনার শরীর ভাল নাই, বেশি খাটনি পারে না। দুধ বেইচাই আমাগো সংসার। দুই পোলা যমজ। উচ্চমাদ্যমিক পাশ কইরা কলেজে ভর্তি হইচিল পরে কইল, আমাগো কলেজে পইড়া লাব নাই। চাকরি হইব না তারচে বাইরে কাম কইরা টাকা জমায়া এইহানে অন্য ব্যাবসা করন যাইব।' 'সেই তো চাকরির গ্যারান্টি নাই। আমার ছেলেও তো অন্যখানে কাজে গেছে গো। দেশে চাকরি কই?' 'কয় ছেলে দিদি তোমার? উনি তোমার মা না শাশুড়ি? কাইল ঘুমাও নাই, রাইতে হাইটা বেড়াইলা?' নিজের ঘরের কথা বলায় তারা আমায় আপন করে নেয়। নানা প্রশ্ন করে।' কাইল যে চ্যাংড়াটা দেখলাম ওইডা কে হয়?' 'ও আমার বড়দার ছেলে।' গ্রামের সাধাসিধে খাটুনে মেয়ে সব, সোজা সাপটা কথা বলে। 'একটাই ছেলে গো আমার। বাইরে থাকে, চাকরি করে।'

শান্তি মণ্ডল বলে, 'খুব কষ্ট করসি গো দিদি। একাত্তরে আইচিল আমার মা বাবা তখন আমি কুলে; খুব গরীব সিলাম আমরা। বিয়া দিসে সেও গরীব আচিল খুব। সাইকেলে মেয়েদের সাজাগুজার জিনিস, বাচ্চার জামা কাপড় খেলনাপাতি বিকরি কইরা ঘুইরা বেড়াইত গেরামে গেরামে। এখন বয়স হইচে বাড়িতেও মেলা কাম কাজ এতডি গরু। দুধ যোগান দিয়া চইলা যায়। আর দিদি আমিও লোকের জমিনে খাটসি আগে, অনেক কাজ করসি। যখন যা পাইসি করসি কিন্তু খাওয়া পাই নাই, বাচ্চা দুইডারে খাওয়াইসি ইস্কুলে পড়াইসি। না খাইয়া থাকতে থাকতে খাদ্যথলি শুকাইয়া গেসেগা। খুব ব্যাথা তয় কাইল অপারেশন হইব। বাড়িত ম্যালা কাম গো দিদি।' 'অপারেশনের পর কিন্তু ভারি জিনিস টানা চলবে না মনে রেখ। বিপদে পড়বে। নিজের শরীরের যত্ন নিও।' সে আমায় তার বাড়ি যাওয়ার আমন্ত্রণ জানায়। কাশিয়াবাড়ি স্টেশনে নেমে খানিক গিয়ে কীর্তনের বাড়ি বললেই লোকে দেখিয়ে দেবে জানায় সে। বৈশাখমাসে তাদের বাড়িতে অষ্টপ্রহর কীর্তন হয়। শান্তির রোগা শরীরে অঢেল প্রাণশক্তি ভরে দিয়েছেন ঈশ্বর! ঘুরে ঘুরে প্রায় সব বেডের মহিলাদের সঙ্গেই আলাপ করি। এই সার্জিকাল ওয়ার্ড যেন ভারতবর্ষ নামের দেশটার মেয়েদের হালহকিকত জানান দিচ্ছে!

লম্বা চওড়া চেহারা উল্কি আঁকা অবাঙালি এক মহিলাকে দেখছি কাল থেকে, বাঁয়ের দেওয়াল ঘেঁষা বেডে। ভাবলেশ শূন্য মুখে শুধু চেয়ে থাকেন। না খেতে দেখেছি না পাশে কোনও পরিজন। কৌতূহল নিয়ে কাছে যেতেই সটান শুয়ে পড়লেন মুখ ঘুরিয়ে! তার পাশের বেডের হাস্যমুখি মহিলার কপালে ব্যান্ডেজ, মাথা ফেটেছে। এও কি মার খেয়েছে? আলাপ হল আজই ছুটি হয়ে যাবে তাঁর। জানালেন স্পন্ডেলাইসিস আছে; মাথাঘুরে পড়ে গিয়েছিলেন বারান্দায় তাতেই মাথা ফেটেছে। আমি স্বস্তির শ্বাস ছাড়ি উফফ, বরের পিটুনি নয়!

অল্পবয়সী দুটো মেয়ের ঘটনা জেনে ভারি অবাক হই! দুজনে দু' কারণে মারামারি করে আহত হয়ে ভর্তি এখানে। বাবা দারুণ তো! একজনার বাড়ির সবজি খেতে গরু ঢুকেছিল; প্রতিবেশীদের খুব গাল দিয়েছিল এই মেয়ে। সে বাড়ির লোকেরা এসে হামলা করে ওর ওপর। মেয়ে একাই যথেষ্ট বীরত্বের সঙ্গে লড়াই করে। মার খায়, মার দেয় পরে এই রোগাপাতলা শরীরে আর অত মার সহ্য হয়নি জ্ঞান হারায়। ডাক্তার ছুটি লেখেনি তাই যেতে পারছে না। পুলিশ কেস হয়েছে!

আরেকটি কালো মেয়ে, সরু ছোট চোখ। চড়ুই পাখির মত সর্বদা চঞ্চল সে চোখের দৃষ্টি। পাড়ার ক'জন তাকে স্কুলে আসতে যেতে টন্ট করে রোজ, কন্যাশ্রীর সাইকেল নিয়ে স্কুলে যাতায়াত না করে তার বিয়েতে বসা উচিৎ। 'গায়ের যা কাউয়ার মত রং বয়স হলে আর বিয়া করবে না কেউ' 'গরীবের বেটির অত পড়ার শখ কেনে' এ ধরনের নানা কথায় তিতিবিরক্ত হয়ে সে

একদিন একাই সাইকেল থেকে নেমে তাদের দিকে তেড়ে যায় তাতে করে ওই দলের মেয়ে-বউরা মিলে তাকে মেরে একেবারে হাসপাতালে পাঠিয়ে দিয়েছে! এটাও পুলিশ কেস, দুতরফ থেকেই। এই রোগাপাতলা শরীরে তার এত তেজ সত্যি অবাক করার মতই। সার্জিকাল ওয়ার্ডের প্রতিটি পেশেন্টের গল্প আলাদা। কাল রাতে মোটাসোটা মাথা ফেটে ভর্তি হওয়া মহিলাটি চলন্ত বাইক থেকে পড়েছে; সে আবার অঞ্চল প্রধান। সন্ধের দিকে কোথায় ঘরোয়া পার্টি মিটিংয়ে যাচ্ছিল দলের লোকের বাইকে। পড়ে গিয়ে এই অবস্থা; তাই বলি মহিলার বেডের পাশে সারাক্ষণ এত ভিড় কেন!

ঘরের চালের ওপর বেয়ে ওঠা কুমড়োর ডগা পাড়তে গিয়ে ওপর থেকে পড়ে হাত আর কলার বোন ভাঙ্গা মাঝবয়সী মহিলাকে বলি, এ বয়সে কেউ টিনের চালে ওঠে? প্রশ্ন শুনে মহিলা বলেন, 'আমি তো পেরায় দিনই উঠি, কিচ্ছু হয় না সেইদিন ক্যামনে যে পইড়া গেলাম ভাইবা হাসন আসে।' 'আপনার হাসি পাচ্ছে, মরেই তো যেতেন হাসপাতালে ঠিক সময়ে না আনলে।' রেগে উঠে মহিলা বলেন, 'কি আকথা কও মরুম ক্যান। অত সহজে শান্তিবালা মরে না। হু মইরা যামু।' বাব্বা কী রাগ। মনেমনে নাম দিই গেছো মাসিমা।

সকালের জানালার ধারের বেডের বছর পনেরোর ফিনফিনে রোগা যে মেয়েটা কাঁদছিল সে তখনও জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে বসে, মাঝে মাঝেই ট্রেনি নার্সেরা তার কাছে গিয়ে দাঁড়াচ্ছে খেয়াল করেছি। এখন কাছে গিয়ে দেখি মাস দুই তিনেকের ছোট্ট একটা শিশু এক টুকরো কাপড়ে জড়িয়ে পাশে শোয়ান! শিশুটি ততধিক রোগা, ঘুমোচ্ছে। 'সকাল থেকে এত কাঁদছ কেন, শরীর খারাপ করবে তো।' মেয়েটা হঠাৎ আমার হাতটা টেনে নিয়ে কোমরে রাখে, 'খিব ব্যাতা। অনেক মারচে, পতিদিন মারে। গলা চিপি দিচিল। পিটে মাচ্চে নাঠি দিয়া। নাত্থি দিচে বুকের মদ্যে।' উফফ কোন ভারতবর্ষ এটা। ক্লান্ত লাগছে আমার। কী করে কোনও মেয়েমানুষের গায়ে হাত তোলে, এমন বেধড়ক মারতে পারে কোনও পুরুষমানুষ? সত্যি মেয়েটার শরীরে এই হাড্ডি ক'টাই সার। তাতেই কি রাগ সেই পুরুষের? আর কী বলে এই বাচ্চা মেয়েটাকে বিয়ে দিয়েছে তার বাপ-মা? হায়রে ভারতবর্ষ, হায়রে আমার বাংলা! হায়রে এত সেমিনার মিটিং মিছিল; উওমেন এমপাওয়ারমেন্টের জিগির। ঠিকঠাক পৌঁচ্ছচ্ছে কোথায় আলোর বার্তা? ভাল লাগছে না, কারুর সঙ্গে নতুন করে কথা বলার তেমন উৎসাহ পাচ্ছি না। হতাশ লাগছে, দুঃখ হচ্ছে খুব।

সামনের বেডের বেগুনি ম্যাক্সি পরা কালো মহিলা আধশোয়া হয়ে এদিকেই তাকিয়ে। পায়ে প্লাস্টার। হাসল, ঝকঝকে সাদা দাঁত। হাসি ফেরত দিই, 'কেমন আছেন? পা ভাঙল কেমন করে?' 'জঙ্গুলে গেসি খড়ি কুড়াইতে, হাথি দেখসি অয় দৌড়াইতে যাইয়ে নালা মে পইড় গেলা।' ঠোঁট উল্টে প্লাস্টারের জায়গাটা দেখায় মহিলা। 'হুম খুব বাইচে গেসো। ধরতে পারলে তো ফুটবল খেলতো তুমকো লেকড়। সমঝি না।' সাদা ঝকঝকে দাঁত বের করে হাসে মহিলা।

নাঃ আর কারুর কাছে তাদের চোটের কারণ জানতে চাইব না। বেশিরভাগই নিম্নবিত্ত পরিবারের খেটে খাওয়া মহিলা। ঘরেবাইরে পরিশ্রম করে সংসারের জন্যই, তারপরেও! আর এই বাইরের চোট, ব্যান্ডেজ, স্যালাইন, প্লাস্টার সব দেখা যাচ্ছে কিন্তু ভেতরে বুকের মধ্যে? মার খাওয়া, অপমানিত হওয়া মহিলাগুলোর বুকের ভেতর কী হচ্ছে? আবার সুস্থ হয়ে ফিরবে সংসারে? ভরসা, বিশ্বাস, প্রেম, যত্ন, সেবা কত কী চায় সংসার সমাজ মেয়েদের কাছে! কিন্তু ... ভাবতে ভাবতে ফিরি, মা চুপ করে শুয়ে, কাল বাড়ি নিয়ে যাব। সার্জিকাল ফিমেল ওয়ার্ড চোখে আঙুল দিয়ে বলে দিচ্ছে ঘরঘর কি কাহানি, দেখিয়ে দিল অনেক অদেখা রক্তের দাগ! দেখিয়ে দিল সমাজ নামের পাখির একটি ডানা কেমন ভেঙে মুচড়ে দেওয়ার অভ্যাস এখনও ছাড়তে পারেনি পুরুষ। হঠাৎ মনে পড়ল উচ্চকোটি ধনী সমাজের রূপসীদের রহস্যময় মৃত্যু সংবাদে কেমন অস্বস্তিতে ভুগছিল দেশ, ফুটফুটে চেহারার শ্রীদেবী, সুনন্দা থারুর আরও আগের মিষ্টি চেহারার নায়িকা মহুয়া চৌধুরী আরও আগের মেরিলিন মনরো! নিজেরাই মরে গেল?

কালো লম্বা মহিলা আধময়লা সাদা সার্ট ম্যাক্সির ওপর, সার্টের বুকে কাঁধে রক্তের দাগ শুকিয়ে রয়েছে। মাথায় ব্যান্ডেজ। আবার মাথাফাটা কেস? বিরক্ত লাগছে,

কালো লম্বা মহিলা আধময়লা সাদা সার্ট ম্যাক্সির ওপর, সার্টের বুকে কাঁধে রক্তের দাগ শুকিয়ে রয়েছে। মাথায় ব্যান্ডেজ। আবার মাথাফাটা কেস? বিরক্ত লাগছে, এত মার খায় কেন? দিতে পারে না উল্টে দু'ঘা? বাথরুম থেকে ফিরছে বিন্তি। তাহলে বনের হিংস্র পশুর সঙ্গে যুদ্ধ করে জিতে এসেছে বিন্তি ওঁরাও! ওকে দেখেই উঠে দাঁড়াই আমি উৎফুল্ল মনে ফিসফিস করে বলি ঘরের পশুদের ঠান্ডা করার মন্ত্র শেখাও বিন্তি ওঁরাও, এত মার খাওয়া যায় নাকি?

এত মার খায় কেন? দিতে পারে না উল্টে দু'ঘা? যত্তসব এত লম্বা শক্তপোক্ত চেহারা নিয়ে মার খেলি কেন? ডানদিকের গালে রক্ত শুকিয়ে জমাট বেঁধে আছে। স্যালাইনের বোতল উঁচু করে ধরে আরেক মহিলা তাকে বাথরুমের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। চা-পাতা তোলার সময় বাগানের মহিলারা এমন সার্ট গায়ে দেয় পোশাকের ওপর। মহিলাটির মুখটা কেমন চেনা মনে হল! কোথায় দেখেছি? কাল বেশি রাতে যে দুজন পেশেন্ট এসেছে এ তারই একজন কী?

লকারটার ওপর দাদা খবরের কাগজটা রেখে গিয়েছিল, চোখ বুলিয়েছিলাম একটু খানিক আগে। বিরক্তিকর ভোটের খবর! ভেতরের পাতার নীচের দিকে খবরটার সঙ্গে মহিলাটির স্পষ্ট ছবি ছিল। হ্যাঁ এই মহিলাই, বিন্তি ওঁরাও। পাতি তোলবার কাজে ব্যস্ত ছিলেন, একটি পূর্ণ বয়স্ক চিতা ওর গায়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে, কাঁধে আর মাথায় নখ দাঁত বসিয়ে দেয়। পড়ে গেলেও বাঘের চোখে আঙুল ঢুকিয়ে দিয়ে বিন্তি গায়ের জোরে বাঘটাকে ঠেলে আর চিৎকার করতে থাকে। আশেপাশের সবাই দৌড়ে এসে লাঠিসোটা দিয়ে মারে, বাঘটা বিন্তিকে ছেড়ে লাফ দিয়ে চা-বাগান ঘেঁষা জঙ্গলে ঢুকে পড়ে। আরেব্বাস এই মহিলাই। বাথরুম থেকে ফিরছে বিন্তি। তাহলে বনের হিংস্র পশুর সঙ্গে যুদ্ধ করে জিতে এসেছে বিন্তি ওঁরাও! ওকে দেখেই উঠে দাঁড়াই আমি। উৎফুল্ল মনে ফিসফিস করে বলি, ঘরের পশুদের ঠান্ডা করার মন্ত্র শেখাও বিন্তি ওঁরাও, এত মার খাওয়া যায় নাকি?

এখন ডুয়ার্স-এ বিজ্ঞাপন দিন

General Rates for Display Ads (INR)

Full Page, Colour:15,000
Full Page, B/W: 9,000
Half Page, Colour: 8,000
Half Page, B/W: 6,000
Back Cover: 30,000
Front Inside Cover: 20,000
Back Inside Cover: 20,000
Double Spread: 30,000

Special Rates for Local Trade only

Strip Ad, Colour: 6,000
Strip Ad, B/W: 4,000
1/4 Page Ad, Colour: 2,500
1/4 Page Ad, B/W: 1,500
1/6 Page, Colour: 1,500
1/6 Page, B/W: 1,000

Mechanical Details: Full Page Bleed {21cm (W) X 28 cm (H)}, Non Bleed {18cm (W) X 25 cm (H)}, Half Page Horizontal {18 cm (W) X 12 cm (H)}, Vertical {8.5 cm (W) X 25 cm (H)}, Strip Ad Vertical {5.6 cm (W) X 25 cm (H)}, Horizontal 18 cm (W) X 6.5 cm (H), 1/4 Page 8.5 cm (W) X 12 cm (H), 1/6 Page {5.75 cm (W) X 12.2 cm (H)}

Rates are effective from April 1, 2018 issue

বিজ্ঞাপন দিতে বা বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন
কলকাতা ৯৯০৩৮৩২১২৩
উত্তরবঙ্গ ৯৪৩৪৪৪২৮৬৬

এখন ডুয়ার্স

ধারাবাহিক কাহিনি। ১১

মহারাণী কথা

মণিদীপা নন্দী বিশ্বাস

মানুষ ফিরে ফিরে আসে। বিশেষ করে নারীর জীবন পর্বের কতগুলো ক্ষণ মাটি ছুঁয়ে থাকে। কখনও বা দূরের নদী ডেকে নেয় অকুণ্ঠ ভালবাসায়। রাণীর পরিপূর্ণ জীবনে কত পাওয়া না পাওয়ার শব্দ, পালা বদলে স্বাবলম্বী আশ্বাসের পর বাবার চলে যাওয়া, মা সোহাগিনীকে নিয়ে নির্ভরযোগ্য এক আশ্বাস সোহাগিনীর জীবনের অনেক বড় পাওয়া। মা-মেয়ে একত্র বাসের এক ইতিহাস। সঙ্গে রাণীর কন্যা উমা বড় প্রশ্রয়ের আদরে লালিত। একা মার সন্তান, স্বাবলম্বী। এই তিন নারীর ঘিরে থাকা মহানগরীর সংসার থেকে রাণী আবার রক্তে মেশা নদীর টানে চাকরি সূত্রে রাজনগর। মহারাণী সুনীতিদেবীর শেষ বয়সের একাকীত্ব, মৃত্যুর পরও নানা ইতিহাস, যন্ত্রণা রাণীকে দৃঢ়চেতা এক অন্য মানুষ করে তোলে।

এত একাকীত্ব কেন! এত যন্ত্রণা! প্রিয় মানুষেরা চলে যায় কেন! যিনি গড়ে দিলেন... পিতৃদেব কেশবচন্দ্র চলে গেছেন কবেই, আজ তুমি চলে গেলে!... লন্ডনে নৃপেন্দ্রনারায়ণের মৃত্যু হল। ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে। ঠিক তারপরই সুনীতির জীবনে একে একে বিপর্যয়। সম্রাজ্ঞীর মনে পড়ে আর এক কবির কবিকে যিনি সমস্ত দুঃখ সয়েও লিখতে পেরেছেন 'আছে দুঃখ আছে মৃত্যু বিরহ দহন লাগি..' কোথায় যেন সুনীতির জীবনকে ছুঁয়ে গেল সে সুর।

সম্রাজ্ঞী তার নির্ধারিত জীবনের ছায়ায় বসে এক মহারাণীর শেষ জীবনের প্রতিচ্ছায়া ছুঁয়ে আছে। কলকাতার লাউন্ডস স্ট্রিটের বাড়িটা। শরীর একদম

ভাল যাচ্ছে না তাঁর। বায়ু পরিবর্তনের জন্য রাঁচিতে গেলেন তিনি। বি.এন.আর হোটেলের তিনটি রুম নিয়ে তিনি ছিলেন। ভাইপো কুমার প্রমোদেন্দ্র নারায়ণকে বলে ওঠা শেষের সেদিনের কথাগুলো স্পষ্ট শোনা যায় এই আবছায়া বিকেলে... তোরা কেউ আসিস না, আমি খুব কষ্ট পাচ্ছি। দেখার লোক নেই। অনেক অসুবিধেয় ভুগছি... শেষ বয়সের রাণী মা। এই লাইনগুলো যখন সম্রাজ্ঞী পড়ে, দু'চোখ থেকে মুক্তোর মত ঝরে জল। যে খরপোষ পেতেন শেষজীবনে রাজ এস্টেট থেকে, তাতে চিকিৎসা করিয়ে জীবন চালানো ছিল কষ্ট। পুত্ররা ততদিনে দেহত্যাগ করেছেন। পৌত্র জগদ্দীপেন্দ্র নারায়ণ বিলেতে। সঙ্গে শুধু ভাই নির্মল সেন, তাঁর স্ত্রী আর মেয়ে ভায়লেট, প্যানজি ও রোজি এবং গজেন্দ্র নারায়ণের স্ত্রী, সুনীতিদেবীর বোন সুরুচি দেবীর মেয়ে সুধা

সম্রাজ্ঞী স্পষ্ট দেখতে পায় অনার্য কন্যা ভানুমতীর মত এক প্রান্তীয় রাজ্যের মহারাণীর রোগশয্যা আড়ম্বর হীন। ...জীবনে অনেক দেখেছে রাণী, যতদিন কাজ আছে, অর্থ আছে, তুমি আছ মানুষের অন্তরে। কিংবা বাইরের সম্মান প্রদর্শনে। যত বড় ইন্দ্রধনুই হোক, যত উজ্জ্বলতাই থাকুক তুলে ধরার মানুষ তো খুব কম। সেই কবে মৃত্যুর হবে তার প্রতীক্ষায় যেন ফাৎনা পেতে আছে সব লোভী সংবাদ গ্রাহকদের মত। কতটুকু শ্রদ্ধা দেওয়া যায় মৃত্যুর পর তার প্রতিযোগিতা চলে। এখানেও বা তার ব্যতিক্রম কোথায়!

শরীর তো কবেই ভেঙেছে তাঁর, কিন্তু সে সময়ের অনেক চিঠি পাওয়া গেছে, কেদারনাথকে লিখেছেন। একটি চিঠিতেও খুব অসুস্থতার কথা তিনি বলেননি, বলতে চাননি কোনওদিন। খুব সামান্য কথায় সেরেছেন। রাজীব মিত্রের কাছে মহারাণী মহারাজা তাঁদের কোচবিহার এই যে প্রাণের সম্পদ আর কাহিনিগুলো একটু একটু করে জড়িয়ে গেছে সম্রাজ্ঞীর অন্তরে, তাতে যেন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ রূপকার পৃষ্ঠপোষক চোখের সামনে দেখতে পায় রাণী। পিএইচডির জন্য বইপত্র কম ঘাঁটেননি, সেই সময়গুলো তখন থেকে ছবির মত সঙ্গে সঙ্গে আছে। মহারাজার মৃত্যুর পর সুনীতি দেবী নিজে প্রজাবৎসল রাজমাতা হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু কোচবিহারে খুব বেশি দিন থাকতে পারেননি তিনি। কিন্তু যেখানেই গেছেন প্রজাদের কথা প্রাসাদের কথা সঙ্গে নিয়েই ছিলেন। বিলেত থেকে লেখা সেই চিঠিগুলো ছোট কিন্তু কী যে প্রাণের টান সেখানে। এখানকার মানুষের জন্য ঔৎসুক্য, কত তুচ্ছ জিনিসের প্রতি ভালবাসা... সম্রাজ্ঞী মহানগরীর ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের মাথায় দাঁড়ানো নিঃসঙ্গ পরীর সঙ্গে মিলিয়ে দেখে মহারাণীর শেষ জীবনের কয়েক বছর। কষ্ট হয়। বিদেশ থেকে রাজকর্মচারী, ব্রাহ্মসমাজের একনিষ্ঠ কর্মী কেদারবাবুকে কত চিঠি লিখেছেন, কাজ করতে গিয়ে লাইব্রেরি থেকে সংগ্রহ করা চিঠির কপি যত্ন করে রেখে দিয়েছে রাণী। তার মনে হয়েছে সেসব ১৯২৮ থেকে ৩০ মধ্যে লেখা। কত তুচ্ছ বিষয়ও যে তাঁর অনুসন্ধানে এসেছে... ছোট ছোট হিসেব ইত্যাদিও জেনে নিয়েছেন, বলছেন—

কেদার,
আশীর্বাদ।

তোমার পত্রসহ হিসাবাদি পাইলাম। সোমবার সন্ধ্যার সময় সেই পবিত্র তীর্থে তোমাদের সকলের সঙ্গে এ আত্মা মিলিত থাকে। ...জল ও আলো কি সহরে হইয়াছে? ...সুনীতি কলেজে যে দুর্গাদাসবাবুর নাতনী টিচার হইয়া আসিয়াছে, এখনও তো আছে, না চলিয়া গিয়াছে, এবার শীতটা আশাকরি খুব স্বাস্থ্যকর হইবে। প্রজারা বড়ই ভুগিয়াছে। সাগরদীঘির জলটা কেমন?

শুভাকাঙ্খিনী

সুনীতি দেবী

আইচ মহাশয়, তরবেন্দ্র, রাধিকা, বিষ্ণু কাছের মানুষদের সংবাদ নিচ্ছেন সেই প্রবাসে বসে। নব বিধানের জুবিলি উৎসবের কথা জানতে চেয়েছেন প্রবল উৎসাহে। নিজে আসতে পারছেন না শারীরিক অসুবিধেয়, কিন্তু মন পড়ে আছে এ শহরের এ কোণ সে কোণ। এস্টেট থেকে মহারাণীর কাছে চাল পাঠান হত, আবার তেঁতুল, সুপারি, কাঁঠাল বীচি এগুলোর কথা চিঠিতে উল্লেখ আছে, সে সব কত ভালোবাসায় উল্লেখ করেছেন মহারাণী। কত না আকুলতায় লিখেছেন, '....আমার নভেম্বর মাসে দেশে পহুঁছিবার কথা। ক্রমে ক্রমে একটু বল পাইতেছি, ইচ্ছা কুচবিহারে গিয়া

চোখের সামনে এ কাকে দেখছে রাণী! যিনি ১৯৩২-এর সেই গভীর রাতের নিস্তব্ধতায় চিরতরে চোখ বুঁজবেন সেই তিনিই ১৯৩১-এ গান্ধীজি যখন গোল টেবিল বৈঠকে যোগ দিতে যান সেই সময় তাঁর সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাতে মিলিত হয়েছিলেন, কোনও দেশীয় রাজ্যের রাণী হিসেবে নয়, একজন সাধারণ ভারতীয়ের মত। তিনিও সেদিন ভারতের মুক্তি কামনায় তাঁর পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছিলেন।

কিছুদিন বাস করি। আশ্রম তীর্থে ফুলগুলি বেশ ফুটিয়াছে ত? নতুন ফুল কি কিছু দিয়াছ? বিধান পল্লীর রাস্তাটি মেরামত করিয়াছ কি? অত্যন্ত নেগলেটেড অবস্থায় ছিল।'

এসব কথায় প্রাণ যে তাঁর এখানেই ঘোরাফেরা করত শেষের কয়েকবছর এ অনুভব করে রাণীর মন কেমন অবশ আচ্ছন্ন হয়। আমলকি আচার, জলপাই আচার, তেঁতুল, তেজপাতা সবকিছুর সঙ্গে তাঁর প্রজাবৎসল গুণ আর জাতীয় মাতৃত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। পরের চিঠিতে বলছেন... 'কুচবিহারের অবস্থা শুনিয়া বড়ই কষ্ট হইতেছে। আর্থিক কষ্ট, স্বাচ্ছন্ন স্বাচ্ছন্দের অভাব সকলই একসঙ্গে আসিয়াছে। এত লোকের চাকরি গেল। প্রাণটা কাঁদিয়া উঠে। কাছে থাকিলে সহানুভূতি ও একটু দুঃখও জানাইতে পারিতাম। প্রজারা কাঁদিতেছে আমি এ বিদেশে ইহা ভাবিতেও ভাল লাগে না। কেবল প্রার্থনা করি, মা লক্ষ্মীর করুণাময় রাজ্যের দুর্দিন যেন শীঘ্র দূর হয় এবং অচিরে লক্ষ্মীশ্রী প্রকাশিত হয়।...'

সমসাময়িক জাতীয় রাজনীতিতে মহারাণী সুনীতিদেবীর স্থান কোথায় সে নিয়ে ভাবনা করে না সম্রাজ্ঞী। কিন্তু এ মানবী ব্রিটিশ রাজের প্রতি কখনওই আনুগত্য প্রকাশ করেননি। বরং তাঁর বিয়ের সময় ব্রিটিশ সরকারের নানা অসহযোগিতা, পিতা কেশবচন্দ্রের অপমান লাঞ্ছনার কথাও তিনি তাঁর আত্মচরিতে বলে গেছেন।

* * *

রাজনগরে সন্ধের অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে। আজ বহুক্ষণ কলেজের পর লাইব্রেরিতে কাটিয়েছে সম্রাজ্ঞী। বই আর ইতিহাস নিয়ে এই যে প্রান্তিক এক শহর যে কিনা একদিন আলাদা রাজ্য হিসেবে গর্বের সঙ্গে সমৃদ্ধি শান্তি নিয়ে কাটিয়েছে সেখানকার ভোরের আলো, কিংবা সন্ধের অন্ধকার অথবা অস্ত সূর্যের আলো এই যে মধ্য বয়সে সম্রাজ্ঞীকে ছায়া দিচ্ছে, সেও দুহাত পেতে নিতে পারছে এতে নিজেকে সৌভাগ্যবতী ভাবে, আত্মশ্লাঘায় সামান্য উদাস হয়ে গেলেও মাটির উপরই দু' পা রাখে সে। চোখের সামনে এ কাকে দেখছে রাণী! যিনি ১৯৩২-এর সেই গভীর রাতের নিস্তব্ধতায় চিরতরে চোখ বুঁজবেন সেই তিনিই ১৯৩১-এ গান্ধীজি যখন গোল টেবিল বৈঠকে যোগ দিতে যান সেই সময় তাঁর সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাতে মিলিত হয়েছিলেন, কোনও দেশীয় রাজ্যের রাণী হিসেবে নয়, একজন সাধারণ ভারতীয়ের মত। তিনিও সেদিন ভারতের মুক্তি কামনায় তাঁর পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছিলেন। নিজে ব্যক্তিগতভাবে মহারাণী অর্থ সাহায্যও করেছিলেন। যে সময় নারীরা অন্ধকারে, পর্দার আড়ালে সে সময়ই এই নারীর দৃপ্তময় পদচারণ, বিলাতযাত্রা, স্বচ্ছ উদার মনস্কতা একজন শুধু প্রান্তদেশের মহারাণী বলে নয় একজন ভারতীয় নারী হিসেবেই মস্তকে সেই শিরস্ত্রাণ আর ওড়নার আবরণে মহিমাময়ী হয়ে ওঠেন বার বার, ছুঁয়ে দিয়ে যান রাণীর চুল, বাবার মতই কোমল এক স্পর্শ অনুভব করে ওই না দেখা অথচ কত প্রিয় এক নারীর।

সবুজ তোরণের বন্ধ দরজার উপর "তমসো মা জ্যোতির্গময়"... লেখা বড় প্রদীপের নীচে সেই সাদা মূর্তির আলোময় মুখের উপর চাঁদের ছায়া পড়েছে। পূর্ণিমার আলো, সদ্য রঙের উৎসব শেষ হল। নগর পরিক্রমায় আবিরে মাখামাখি, এখানে মদনমোহন চত্বরে তাঁর পায়ে আবির ছুঁইয়ে একে অন্যেকে আবির ছোঁয়ানো প্রথা। এখনকার উদ্দামতা অন্য রকম। ছাত্রছাত্রীরা কেউ কেউ এসেছিল সম্রাজ্ঞীর ফ্ল্যাটে। সোহাগিনীসহ উমাকে নিয়ে এসেছে এবারের ছুটিতে সম্রাজ্ঞী। সোহাগিনীর চলতে অসুবিধে হয় এখন। ওষুধপত্র, নিয়ম সবটুকু রাণী নিজে হাতে করে, আর উমা এসে পড়লে কথাই নেই। ওর পড়াশুনো কাজকর্মের ফাঁকে দিম্মাই সারাক্ষণের সঙ্গী।

সম্রাজ্ঞী রাতের অন্ধকারে প্রতিটি রাতেই এক একবার বিচিত্র ভাবনায় ঐশ্বর্যময়ী হয়ে ওঠে, কখনও এসে দাঁড়ান বাবা রাজীব, কখনো যশোধরা, বুদ্ধ পত্নী, কখনো মহারাণী যিনি সঙ্গে আছেন। আঙুল ছুঁয়ে থাকেন যিনি মার মত। সত্যি কার মা, একা থাকার বন্ধু। প্রেরণা।

* * * *

সময় ফুরিয়ে এল প্রায়। একবছরে অনেকগুলো পেপারস করিয়েছে ছাত্রছাত্রীদের। দু' একজন বেশ ব্রাইট। আর এখন তো এবিএন শীল পঞ্চানন বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত। প্রথম শুনে ধাক্কা লেগেছিল ঠিকই, আবার ভেবেছে, আমার সময় কী ছিল ভেবে লাভ কী! এখন দেখছে উন্নতির চেষ্টা চলছে, মানোন্নয়ণ প্রচেষ্টাও পিছিয়ে নেই। পরিপূর্ণতা সঙ্গে থাকে, আসলে কাজ করতে গেলে কোনও রকম নেতিবাচক দিক সঙ্গে নিয়ে

শুরু করা ঠিক নয়। ওদিকে উমার ক্লাস শুরু হয়ে গেছে, এক সপ্তাহের পর ওকেও এখানে রাখা ঠিক হবে না। সোহাগিনী এত অসুস্থ যে, মেলে ওষুধপত্র ডাক্তারি যোগাযোগ সব করতে হয়েছে।

সোহাগিনীর বিছানার পাশে খুব কম পাওয়ারের আলো। পাশের কালো কাচের গোল টেবিলটার উপর বসে আছেন সোনার রঙের বুদ্ধ মূর্তি। এখানে কলেজের ছাত্রছাত্রীর তরফে টিচারস ডে'র প্রাপ্তিযোগ। উমাও মনের আনন্দে প্রদীপ জ্বেলেছে, ধূপ জ্বেলেছে। তবে ধূপের ধোঁয়া বেশিক্ষণ রাখতে দেয় না রাণী এ ঘরে, সোহাগিনীর কষ্ট হবে বলে, তাই সোহাগিনীর নিষেধ সত্ত্বেও উমাকে আর এ ঘরে ধূপ পোড়াতে দেয় না রাণী। প্রদীপ জ্বলে খানিকক্ষণ রেখে নিয়ে যায়। এখানে দু' কামরার ঘরে রাণী উমাকে সঙ্গে করেই ঘুমোয়। আর মাঝে মাঝেই সোহাগিনীর জন্য জেগেই থাকে সে। উমা খানিক্ষণ পড়াশুনো করে। দুজনের খাওয়ার প্লেটে সাজিয়ে ডাক দেয়। এটুকুই তো পাওয়ার ছিল। চোখের দু' কোণে কোনও নিরাশার বিন্দু নয়, ভালবাসার অশ্রু জড়ো হয়। বড় বেশি করে পুরনো কথা মনে পড়ে। তোর্সার বাঁধের উপরের রাস্তা ধরে উমাকে নিয়ে সকাল সকাল হেঁটে এসেছে, খুঁজতে চেষ্টা করেছে পুরনো ছবির মত বাড়িটার সে পুরনো ফটক, আবার মনে মনে হেসেছে। সে কী করে হবে! সব কি আর একই রকম থাকে কোনওদিন! মানুষই বদলে যায়। তবু চলার পথে মানুষের খোঁজ ফুরোয় না। চেনা মনে হলে কখনও অপলকে তাকিয়ে থাকে। কখনও বা মিলে যায়।

...অ্যাই... তুই তুলি না?

...চিনেছ? আমি তো ভেবেছি তুমি চিনবেই না। তোমার কিন্তু বদল ঘটেনি তেমন।

...কী যে বলিস, কতগুলো বছর পেরোলাম, এক থাকে নাকি কেউ! ...তা তুলি.. এত মোটা হয়ে গেলি কী করে?

...আর বলো না। সব রোগ ধরেছে। এখন হাঁটতেও কষ্ট। তোমার কথা বলো, বিয়ে করলে না আর রাণীদি?

...কেন বিয়ে কি করতেই হবে নাকি? বেশ আছি বুঝলে তুলি, এই আমার কন্যে উমা।

ভ্রূ কুঁচকে তাকায় তুলি। কোন প্রশ্ন করার আগেই রাণী বলে, চলিরে তুলি, ভাল থাকিস। পিছন ফিরে আর দেখবে না, কত প্রশ্ন নিয়ে তাকিয়ে আছে একজোড়া কৌতূহলী চোখ। থমকে থাকা এখনকার এক শহরের ততোধিক থমকে থাকা এক নারী। বাতাসে উড়বে কত কল্পনা, কত গল্প, এ মাটিই ছিল কোনও মহীয়সীর গড়ে তোলার এগিয়ে নেওয়ার স্বপ্ন।

দেখ, উমা, ওই যে রাস্তাটা নেমে গেছে, ...ওই-ই-ই যে কুয়োর ধার, ওরই কাছে আমাদের বাড়ি ছিল। কাঠ গোলাপে ছেয়ে থাকত গেট। আমরা দোলনা দুলতাম। বলার সময় গলাটা কেমন ধরে যায় না! উমা বোঝে। হাত ধরে। মাম দেরি হয়ে যাবে। চল হাঁটি... দিম্মা উঠে পড়েছে এতক্ষণে।

* * *

আবছা ভোরের আলো মেখে ঘরে ঢুকছে দুই নারী, সন্তর্পনে খুব ধীর উচ্চারণে শুনতে পায় বিছানায় আধশোয়া সোহাগিনী উচ্চারণ করছে খানিকটা সুরে মন্ত্রের মত। বুদ্ধ উজ্জ্বল... কোথায় যেন পবিত্র বাতাস ছুটে আসে

স্বর্ণ বর্ণে সমুজ্জ্বল নব চম্পাদলে
বন্দিব শ্রী মুনীন্দ্রের পাদ পদ্মতলে
পুণ্যব গন্ধে পূর্ণ বায়ু হল সুগন্ধিত,
পুষ্পমাল্যে করি তাঁর চরণ বন্দিত

চোখে মুক্তো বিন্দু। রাণীর কেমন বিহ্বল বোধ হয়, যেন সেই শিশুকাল। এখনিই প্রকৃতি বলে উঠবে 'ফুল বলে, ধন্য আমি ধন্য আমি মাটির পরে...' মাকে জড়িয়ে থাকতে ইচ্ছে হয়। খাটের কোণে বসে মা'র পায়ে হাত রাখে রাণী। মন্ত্র উচ্চারণ শেষ, ঠোঁটে শিশুর হাসির মত সরলতা। উমা কাছে এসে দাঁড়ায়।

আর সাতদিন। ফ্লাইটে ফিরে যাবে ওরা। সোহাগিনীর শান্তিটুকুই একমাত্র লক্ষ্য রাণীর। বুদ্ধের উজ্জ্বল আলোয় রাণীর মনে পড়ে সুনীতি দেবীর জীবনের একেবারে শেষ রচনা ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে 'The life of Princess Yashodara: The wife and disciple of the Lord Buddha.'

চোখের দু' কোণে কোনও নিরাশার বিন্দু নয়, ভালবাসার অশ্রু জড়ো হয়। বড় বেশি করে পুরনো কথা মনে পড়ে। তোর্সার বাঁধের উপরের রাস্তা ধরে উমাকে নিয়ে সকাল সকাল হেঁটে এসেছে, খুঁজতে চেষ্টা করেছে পুরনো ছবির মত বাড়িটার সে পুরনো ফটক, আবার মনে মনে হেসেছে। সে কী করে হবে! সব কি আর একই রকম থাকে কোনওদিন! মানুষই বদলে যায়। তবু চলার পথে মানুষের খোঁজ ফুরোয় না। চেনা মনে হলে কখনও অপলকে তাকিয়ে থাকে। কখনও বা মিলে যায়।

১৯১১ খ্রিস্টাব্দে নৃপেন্দ্রনারায়ণের মৃত্যুর পর থেকে নানা দুঃখ কষ্টের জীবন তাঁর। তাঁর প্রথমা কন্যা সুকৃতিদেবীর বিয়ে হয় স্বর্ণকুমারী দেবীর পুত্র, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের দৌহিত্র জ্যোৎস্না নাথ ঘোষালের সঙ্গে। ১৮৯৯ সালে বিয়ে হয় ব্রাহ্ম মতে। দেবেন্দ্রনাথ ও কেশবচন্দ্রের মধ্যের যে দূরত্ব তৈরি হয়েছিল, দুই পরিবারের শুভ বন্ধনে মহারাণী সুনীতি দেবী তা দূর করতে চেয়েছিলেন। ঠাকুর পরিবারেও অসবর্ণ বিবাহের শুরু। ইংল্যান্ডের দুই ইংরেজ তরুণের সঙ্গে অন্য দুই কন্যা প্রতিভা ও সুধীরার বিয়ে হয়। জন ম্যান্ডার ও হেনরী ম্যান্ডার নাম দুজন ইংরেজ যুবক। অল্পদিনের মধ্যের বিচ্ছেদও ঘটে যায়। জ্যেষ্ঠ পুত্র রাজরাজেন্দ্র নারায়ণ ভালবেসেছিলেন Edna May নামে ইংরেজ অভিনেত্রীকে। পারিবারিক বাধায় সে বিয়ে হয়নি। অতিরিক্ত মদ্যপানে অল্প বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়। দ্বিতীয় পুত্র জিতেন্দ্রনারায়ণও মাত্র ৩৬ বছর বয়সে লন্ডনে মৃত্যু বরণ করেন। ছোট ছেলে রাজকুমার হিতেন্দ্রনারায়ণ ও দ্বিতীয়া কন্যা প্রতিভাসুন্দরীর মৃত্যু হয় ১৯২০ ও ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে।

জীবনের দুঃখ-শোক তার গভীর বেদনা সুনীতি দেবীর জীবনকে দুঃসহ করে তুলেছিল। রাজমাতা হিসেবেও শেষদিকে তেমন উজ্জ্বল শ্রদ্ধার স্থান তাঁকে দেওয়া হয়নি। নানা শোক দুঃখে ভারাক্রান্ত সুনীতি ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে ইংল্যান্ডে একমাত্র জীবিত পুত্র প্রিন্স ভিক্টর নিত্যেন্দ্রনারায়ণের কাছে চলে যান। সেখানে কিছুদিন থাকার পর অসুস্থ হয়ে যান। ১৯৩১ এ অসুস্থ অবস্থায় কলকাতায় ফেরেন। ডাক্তারের পরামর্শে রাঁচিতে চলে যান বিশ্রামের জন্য। সেখানেই বিএনআর হোটেলে ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দের ১০ই নভেম্বর ভোর রাত ৩.৩০-এ বুদ্ধদেবের মত মহারাজ নৃপেন্দ্রনারায়ণ যেন এসে দাঁড়িয়েছিলেন সমস্ত যন্ত্রণা মুছে দিতে। সুনীতি দেবীর মৃত্যু হল।

সুনীতি দেবীর সংসার বৈরাগ্য এসেছিল মহারাজ চলে যেতেই। তখন থেকেই পুরোপুরি সন্নাসিনী জীবন তাঁর। গৈরিক বস্ত্র, নগ্ন পদে ব্রহ্মোৎসব বা নগর কীর্তনে বেরিয়ে পড়তেন আর অন্তরে বুদ্ধপত্নী যশোধরার কথাই স্মরণ ককরতেন। তাঁর আধ্যাত্মিক চেতনায় যেন জীবাত্মা-পরমাত্মার মিলন সংবাদ। তাঁর শেষ গ্রন্থ The life of Yasadara ...য় বুদ্ধদেবের দীর্ঘ ছয় বছর সাধনার পর সাত বছরে বোধিলাভের পর যশোধরার সঙ্গে আবার দেখা বুদ্ধের। যশোধরা বুদ্ধের পাদস্পর্শ করলেন। সন্ন্যাসিনী যশোধরা সংসার-ধর্ম পালনের শেষে বুদ্ধের অনুমতি নিয়ে ভিক্ষুণী ব্রত গ্রহণ করলেন। দুটি আত্মার যেন মহা মিলন ঘটেছে এখানে। সুনীতি বর্ননা করেছেন, ...উমা শোনে তার মা উচ্চারণ করছে, 'For Yashodara, life now had a higher meaning. She had suffered much in seven years of her husband's absence.When she found him again their souls were reunited, but not in earthly love. Here was spiritual union. Even as a nun, where everybody a went, many women followed her...'

বাইরে ততক্ষণে সূর্যের আলো ফুটেছে। তার একটু আভা কালো কাচের টেবিলে বুদ্ধের মুখে এসে পড়েছে।

মৃত্যুর পর সে মানুষের পারলৌকিক কাজ হিন্দু মতে হোক বা ব্রাহ্ম মতেই হোক তাতে কী যায় আসে! তখন তো তিনি বিশ্বময়ী। অনন্তে মিলিত হয়েছেন যশোধরার মতই পরমাত্মার সঙ্গে।...

উমার স্নান হয়ে গিয়েছে আগেই। সম্রাজ্ঞী আজ আর মায়ের কাছ থেকে সহজে সরে যাবে না। খুব ধীরে সোহাগিনী মেয়ের কাছে আবদারের সুরে বলেন আমায় একবার নিয়ে যাবি সে বাড়ির কাছাকাছি তোর্সার ধারে... যেখানে নারকেল পাতায় ঝিরঝিরে বাতাস, কাঠগোলাপের হলদে সাদা রং... রাণী সেই ছেলেবেলার মত মার বুকের ভিতর মুখ লুকিয়ে থাকে। বলবে না, বলতে পারবে না সে, ওই মাটিই বদলে গেছে মা, সে নদী নেই, মানুষ নেই... সে গাছও নেই।

উমা তখন জানলায়। বুদ্ধদেবের মুখ প্রদীপে উজ্জ্বল। রাণীর কাছে শেখা গানের শব্দরা সুর হয়েছে তখন... উমার কণ্ঠ কেমন হাহাকারের মত শোনায়

....জানি না হায়রে কী দুরাশায় রে
পূজাদীপ জ্বালি মন্দির দ্বারে।
আলো তার নিল হরিয়া দেবতা ছলনা করিয়া
আঁধারে রাখিল আমারে...

তিন নারী খুব ধীরে মন্ত্র উচ্চারণের মত বলে...

যো সন্নিসিন্নো বরবোধিমূলে
মারসস সেনং মহতিং বিজেত্বা
সম্বোধি মামঞ্ছি অনন্তঞ্ঞানো
লোকুত্তমো তং পণমামি বুদ্ধং
.....বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি...

(সমাপ্ত)

ধারাবাহিক। প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য। তিন পর্বে সমাপ্য। তৃতীয় পর্ব

যে শরীর ডাউনলোড হয়

তিনবন্ধু মিলে খুন করেছিল ব্যালেরিনা গুরুংকে। তারপর এল নয়না রবাবী তাঁর সেক্স গেম নিয়ে। তিনবন্ধুর জীবনে যৌনতার খেলা নিয়ে এল এক বিচিত্র সঙ্কট। সুপারি কিলার রাধু মাহাতকে দেখল ঋতম। তাঁকে টাকা দিয়েছে নয়না রবাবী। রাধু জানাল যে নয়না তাঁকে ফোন করেছে ঋতমের কাছ থেকে নাম্বার পেয়ে। ঋতম হতভম্ব। এ কী ভাবে সম্ভব? নয়না রবাবী কী ভাবে জানল যে ঋতম-রাধুর যোগাযোগ? নয়না রবাবী তাহলে কে? যাবতীয় জট-জটিলতার অবসান এবার।

অরণ্য মিত্র

৮

ডেঙ্গুয়াঝাড় চা-বাগান পেরিয়ে একটা বাঁকের মুখে রাস্তার পাশে খানিকটা খোলা জমি পেয়ে গাড়ি দাঁড় করাল হিমেশ। জলপাইগুড়ি থেকে ফিরতে শুরু করার পর এতক্ষণ সে চুপচাপ গাড়ি চালিয়েছে। বিনায়ক অবশ্য টানা কথা বলে যাচ্ছিল। শেষে হিমেশের কাছ থেকে সামান্য 'হুঁ' বা 'না' পাওয়া যাচ্ছে না দেখে চুপ মেরে গেছে।

'তুই আসার সময় স্বপ্ন দেখেছিলি না একটা?' বিনায়কের দিকে তাকিয়ে সে জিগ্যেস করল।

'সেই ট্র্যাপ?' বিনায়কের চোখ ছোট হয়ে গেল। 'তোর কি মনে হচ্ছে সেটা?'

'যা ঘটছে তুই কি তা বুঝতে পারছিস?'

'নট অ্যাট অল ইয়ার।' বিনায়ক হৈ হৈ করে বলতে লাগল। 'গেমস্ ব্যাপারটা ছেড়ে দে। বাট রাধুকে নয়না রবাবী ঋতমের রেফরেন্স দিয়ে ডেকেছে— হাও ইজিট পস্‌সেবেল ইয়ার? নয়না রবাবী সুপারি দিচ্ছে? দিলে আমাদের কী? আমরা কেন জড়াচ্ছি?'

'মাথা ঠান্ডা কর ইয়ার। বী কুল।' ঠান্ডা গলায় বলল হিমেশ। 'স্টেপ বাই স্টেপ ভাব। আমি নয়না রবাবীকে ফোন করছি।'

মোবাইলের স্পিকার চালু করে ফোন দিল হিমেশ।

'হ্যালো! এনি প্রবলেম স্যার?'

'আপনি কি জলপাইগুড়ি?'

'নো স্যার! আই হ্যাভ বিন দার্জিলিং— কাল রাতে আপনি যখন ফোন করলেন, আই ওয়াজ হেয়ার ইন হোটেল।'

'সত্যি?'

'ডু ইউ নিড প্রুফ স্যার?'

নয়না রবাবীর গলায় একটু কৌতুকের আভাস পাওয়া গেল। হিমেশও শান্ত গলায় বলল, 'ক্যান ইউ প্রুফ?'

'লাইনটা ছেড়ে দিন। আমি ভিডিও কল করছি।'

আধ মিনিটের মাথায় নয়না রবাবীর ভিডিও কল গ্রহণ করে হিমেশ। নয়না রবাবী গোলাপি শার্ট পরে হাসিমুখে তাকিয়ে। পেছনে যে দার্জিলিং স্টেশন, তা হিমেশের বুঝতে আধা সেকেন্ডও লাগল না।

'হাই ডিটেকটিভ!' হাত দেখাল নয়না রবাবী। 'দিস ইজ দার্জিলিং স্টেশান। নাও আয়াম সেইং মাই হোটেল'স নেম এন্ড রিসেপশানস্ নাম্বার। জাস্ট কল এন্ড আস্ক আমি কবে থেকে সে হোটেলে আছি।'

'এনাফ!' হিমেশ হাসিমুখে বলল। 'আপনি কোথায় আছেন তা নিয়ে বাজি ধরেছিলাম। প্লিজ টেক ইট অ্যাজ আ— ইয়ে—।'

'ওকে ওকে!' নয়না রবাবী হাসল। 'হোপ এভরিথিং গোয়িং রাইট!'

'আপনি রাধু মাহাতকে চেনেন?'

'ইজ হি আওয়ার কাস্টমার?'

'ডিড ইউ মিট এনিওয়ান নেম রাধু মাহাত?'

'কাস্টমার আর কলিগদের বাইরে কাউকে মিট করি না স্যার। আই ডিড নট মিট এনি রাধু মাহাত রিসেন্টলি। আপনি কি এটারও ওপরেও বেট ধরেছেন স্যার?'

'থ্যাঙ্কি উ। ফোন ইউ লেটার।'

'ওয়েলকাম স্যার!'

আবার দুষ্টু দুষ্টু হাসিটা মুখে একবার খেলিয়ে দিল নয়না রবাবী। বিনায়ক সবই দেখছিল আর শুনছিল।

এবার বলল, 'নয়না মিথ্যে বলে নি ইয়ার। দেয়ার ইজ নো কানেকশান বিটুইন শি এন্ড রাধু।'

'তাহলে ঋতম মিথ্যে বলছে?' বিড়বিড় করে উচ্চারণ করল হিমেশ। বিনায়ক কথাটা শুনে বেশ অবাক হয়ে তাকাল। ঋতম কেন মিথ্য বলবে? বিনায়কের মাথায় চট করে খেলল না কিছু।

'বাট হোয়াই ডিড হি টেল আ লাই?' বিড়বিড়িয়ে আবার যেন নিজেকেই জিগ্যেস করল হিমেশ।

'ঋতম নিজের চোখে দেখেনি ফ্ল্যাটে কে ভাড়া এসেছে।' বিনায়ক হঠাৎ এবার যুক্তি খুঁজে পায়। 'আমার মনে হচ্ছে সেকেন্ড একটা নয়না রবাবী আছে যার সঙ্গে রাধুর ডিল হচ্ছে। আমরা ফালতু চাপ নিচ্ছি।'

'রাধু মাহাতকে কি আমরা দেখেছি?'

হিমেশের পাল্টা প্রশ্নে বিনায়ক থতমত খেয়ে চুপ করে গেল।

'রাধুকে আমরা দু-জন কেউই দেখি নি। ঋতম দেখেছে। বাট হি মে মিসটেক। জাস্ট থিঙ্ক বিনায়ক, ঋতম যদি ভুল করে কাউকে রাধু মনে করে এন্ড ইফ হি ফলো দ্য ফেক রাধু— তবেও এই গল্পটা শেষ হয়ে যাচ্ছে না, বিকজ দেয়ার ইজ নয়না রবাবী।' হিমেশ সিগারেট ধরাল। তাঁকে বেশ চিন্তিত দেখাচ্ছিল। 'লেটস্ থিঙ্ক ঋতমের ব্যালেরিনার দাদার ফ্ল্যাটে নয়না রবাবী সত্যিই ভাড়া এসেছে। ইট ক্যান বী পসিব্‌ল্। রাধুর মত দেখতে একটা লোক তাঁকে মিট করেছে— এটাও পসিব্‌ল্। বাট দ্য কোয়েশ্চেন ইজ ঋতম কি এত ভুল করবে?'

'না করার কারণ নেই।' বিনায়ক আবার কথা খুঁজে পেল। 'রাধুকে দু-তিনবারের বেশি দেখেনি ঋতম। আর সুপারি কিলারেরা যেখানে একবার অপারেশন চালায়, সেখানে সেকেন্ড টাইম চট্ করে আসে না।'

'হোপ ইউ আর রাইট।'

'তুই কি অন্য কিছু ভাবছিস হিমেশ?'

'নয়না রবাবী যে জাস্ট বলল শি হ্যাজ বিন ইন দার্জিলিং।' হিমেশ অন্যমনস্কের সুরে বলল কথাটা। 'তাই যদি হয় তবে তো টাইম মিলছে না ইয়ার!'

'দেন হু টেলস লাই?'

হিমেশ তখুনি জবাব না দিয়ে গাড়ি স্টার্ট করল। চল্লিশের আশপাশে গাড়ি চালাতে লাগল সে। বিনায়ক তাঁর জবাবের জন্য অপেক্ষা করছিল। কিন্তু হিমেশ কিছু বলছিল না। বেলাকোবার কাছাকাছি এসে বিনায়ক শুনল তাঁর ফোন বাজছে। ঋতমের ফোন। বিনায়ক একবার তাকাল হিমেশের দিকে। তারপর রিসিভ করল কলটা। হিমেশ দেখল ফোনে কথা শুনতে শুনতে বিনায়কের চোখমুখ বদলে যাচ্ছে। গাড়িটা সে থামিয়ে দিল তক্ষুনি।

'কার ফোন?'

'ঋতম।' বিনায়ক ফোনটা গাড়ির সিটে আলতো করে ফেলে দিয়ে দু-হাতের তালু দিয়ে মুখটা মুছে নিয়ে বলল।

'কী বলল?'

'আমরা হোটেল থেকে বেরিয়া যাওয়ার পর রাধু এসেছিল ওর সঙ্গে দেখা করতে। তাঁকে নয়না রবাবী এডভান্স করেছে এন্ড দ্যাট ফাকিং লেডি সেড যে রাধুর নাম্বার সে পেয়েছে ঋতমের কাছ থেকে।'

'ও গড! হোয়াট দ্য ফাক্ ইজ গোয়িং অন!'

স্টিয়ারিং-এ একটা থাপ্পড় মেরে চিৎকার করে উঠল হিমেশ। এবার তাঁর সব কিছু গুলিয়ে যাচ্ছে। তাঁর উত্তেজনা লক্ষ্য করে বিনায়ক কিছু বলল না। মিনিট দুয়েক পর নিজেকে সামলে হিমেশ বিড় বিড় করে বলল, 'ওকে! কাল আমরা তিনজন একসঙ্গে ওই ফ্ল্যাটে যাব। তার আগে রাধুর সঙ্গে মিট করতে হবে।'

৯

তিস্তা নদীর বাঁধ ধরে খানিকটা এগিয়ে গেলে একটা রেস্তোরাঁ পাওয়া যায়। ঋতম সেখানে একটা টেবিল নিয়ে চুপচাপ বিয়ার খাচ্ছিল। সন্ধে প্রায় হয়ে এসেছে। দূরে তিস্তা ব্রিজের আলোগুলো স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে এখন। হালকা হাওয়া। বিয়ার খেতে খেতে ঋতম আসলে অপেক্ষা করছিল রাধু মাহাতর জন্য। হিমেশের প্ল্যান অনুযায়ী কাল কোনও এক সময়ে ব্যালেরিনার দাদার ফ্ল্যাটে হানা দিয়ে নয়না রবাবীকে ধরতে হবে। কিন্তু তাঁর আগে রাধুর কাছ থেকে একটা জিনিস জানার আছে।

পুরোপুরি অন্ধকার নেমে আসার পর রাধুকে দেখা গেল রেস্তোরাঁয় ঢুকতে। ধীর পায়ে এগিয়ে এসে ঋতমের মুখোমুখি বসে বলল, 'এভাবে মিট করা ঠিক হোচ্চে না। আমি তো বোল্লম যে ওই লেডিকে আমি বুঝে নিবো।'

'ব্যালেরিনাকে তুমি ঠিকঠাক খতম করেছিলে?'

ঋতমের প্রশ্নে রাধু বেশ অবাক হল। 'আপনে এ বাৎ বোলছেন কেনো? ডেড বডি তো মিলা, না?'

'ব্যালেরিনা যদি মরে গিয়ে থাকে তবে তাঁকে কে মেরেছে সেটা আমাদের বাইরে কেউ জানে না।'

'সেটাই তো হোবে।'

'কিন্তু আমাদের মনে হচ্ছে কেউ ব্যাপারটা জানে আর সেই লোককে আমরা জানি না।'

'ইয়ে না মুমকিন দাদা।' রাধু হাসল। 'ওরকম কাম আমি কোরব না।'

'নয়না রবাবী দার্জিলিং-এ।'

'ইয়ে হো সকতা। আজ চোলে গেলেন কি?'

'নয়না রবাবীর ফ্ল্যাটে আর কেউ থাকে?'

রাধু কয়েক সেকেন্ড ভেবে নিয়ে জবাব দিল, 'বোলতে পারব না। লেকিন আমার মোনে হয়েছে নায়না রাবাবী একা একাই ছিলেন।'

'তুমি এখান থেকে নয়না রবাবীকে একটা ফোন কর। স্পিকার অন করে দাও। জিগ্যেস কর সে কোথায় আছে।'

'ঠিক হ্যায়।'

রাধু মাহাত ফোন করল। কয়েক সেকেন্ড পর নয়নার গলা শুনল ঋতম, 'হ্যালো।'

'ম্যায় রাধু মাহাত।'

'ফোন কিঁউ কিয়া। তোমাকে তো আমি ফোন করব বলেছিলাম।'

'আপনি আখুন কোথায় আছেন?'

'জলপাইগুড়ি। কিন্তু এখন তুমি আমার এখানে আসবে না। আর নিজে থেকে ফোন করবে না— বুঝেছ?'

'ঠিক আছে। লেকিন হাম জ্যায়দা দিন জাল্পাইগোড়ি মে ওয়েট করতে পারবে না মেডাম!'

'ওকে। কাল তোমাকে বলে দেব কী করতে হবে।'

রাধু কিছু বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু নয়না রবাবী ফোন কেটে দিয়েছে।

'আমি এখানে এসে ওকে ফোন করেছিলাম। বলেছিল, দার্জিলিং-এ আছে। হিমেশ ফোন করেছিল দুপুরে। ওকেও তাই বলেছে। কিন্তু এখন তো তুমি নিজেই শুনলে সে কোথায় আছে।'

'ঠারিয়ে দাদা!' রাধু মাহাত হঠাৎ একটু চমকে উঠল। 'কেয়া আপলোগ ওই নায়না রাবাবীকে চিনেন?'

'আমরা তিনজনই চিনি।'

'লেকিন ক্যায়সে?'

'একটা গেম কোম্পানির হয়ে এসেছিল। গেমটা আমরা খেলছি।'

'সমঝা নেহি।'

'নয়না রবাবী বোধহয় পুলিশের কেউ। সে একটা ফাঁদ পাতছে।'

'ফান্দ?'

'তুম জালমে ফাঁসতে হো রাধু।'

'মতলব?'

'ভেবে দেখ রাধু, পুলিশ ব্যালেরিনার কেস সলভ করতে পারে নি। মনে হয় তাঁরা এখনও তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছে। কোনও ভাবে কিছু একটা আন্দাজ করে তোমাকে ডেকে এনেছে আমার কথা বলে। এবার তোমাকে ফাঁসাবে। তারপর আমরাও ফাঁসব।'

রাধু থম মেরে গেল। এবার সে কিছু একটা বুঝতে পারছে। নয়না রবাবী তাঁকে কাজ দেবে আর কাজটা করতে গেলেই ফেঁসে যাবে সে। প্রমাণ হয়ে যাবে সে একটা সুপারি কিলার।

'পারলে আজকেই জলপাইগুড়ি ছেড়ে দাও রাধু। তোমাকে না পেলে নয়না রবাবীর প্ল্যান কাজ করবে না। তারপর ওকে আমরা পরে বুঝে নেব।'

'আপ ঠিক বোলা দাদা। শেল্লিগোড়িকা বাস মিল যায়ে গা। রাতে আনজেপি থিকে টিরেন পাকাড় লিব।'

রাধু মাহাত রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়ে পড়ল। হোটেলে ফোন করে বলে দিল আর ফিরছে না। আজ অব্দি বিল মেটানই আছে এবং লাগেজ বলতে একটা ছোট ব্যাগ যা সে সঙ্গে নিয়েই ঘোরে।

আধ ঘণ্টার মধ্যে জলপাইগুড়ি বাস স্ট্যান্ডের কাছাকাছি এসে রাধু টোটো থেকে নামল। সামনেই এনবিএসটিসি-র একটা নীলরঙা বাস দাঁড়িয়ে। সেটা শিলিগুড়ির দিকে যাচ্ছে কি না সেটা জানার জন্য দ্রুত রাস্তা পাড় হল সে। কিন্তু বাসটার দিকে আর এগিয়ে গেল না। কারণ বাস থেকে নামছে নয়না রবাবী।

রাধু দমবন্ধ করে একটা টোটোর আড়ালে রাখল নিজেকে। নয়না রবাবী রাস্তা পাড় হওয়ার জন্য এদিক ওদিক তাকাচ্ছে। রাধু ঠিক তাঁর পেছনে হলেও কয়েক ফুট দূরে। নয়না রবাবী পেছনে তাকালেও চট করে দেখতে পারবে না টোটোর আড়ালের কারণে। কিন্তু নয়না রবাবী পেছনে তাকাল না। রাস্তার ওপাড়ে গিয়ে হাঁটতে লাগল তাঁর গন্তব্যের দিকে

রাধু মাহাত ফোন করল ঋতমকে। 'নায়না রাবাবী আভি শেল্লোগোড়ি থিকে ফিরল।' তারপর ফোনের ঢাকনা খুলে সিমকার্ডটা বের করে ভেঙে ফেলে দিল পাশের নর্দমায়। তারপর খানিকটা দূরত্ব বজায় রেখে অনুসরণ করতে লাগল নয়না রবাবীকে। বাস স্ট্যান্ড থেকে ওর ফ্ল্যাট পর্যন্ত রাস্তাটা রাধু মাহাতর চেনা হয়ে গেছে। হেঁটে যেতে মিনিট পনের লাগে খুব জোর। গলিতে ঢুকলেই সে একটা চান্স নেবে। নয় তো দেখে আসবে ফ্ল্যাটেই গেল কি না।

সিমটা ফেলে দেওয়ার কারণ ওতে নয়না রবাবীর সঙ্গে কথাবার্তার প্রমাণ আছে। অতিরিক্ত দুটো সিমকার্ড সব সময় সঙ্গে রাখে রাধু মাহাত। এটা একটা পুরনো কিন্তু কার্যকর টেকনিক।

রাধুর প্রিয় পিস্তল হল ওয়ান শটার। এবার যেটা সে এনেছে সেটা একটু ছোট। কিন্তু সাইলেন্সার লাগান যায়। রাধু হাঁটতে হাঁটতে ব্যাগের তলার একটা চেইন খুলে সাইলেন্সারটা বের করে নিল। শটার তাঁর কোমরেই গোঁজা। ব্যাগটার আড়ালে শটারের সাইলেন্সার লাগিয়ে

নিল পেশাদারি দক্ষতায়। গলিতে লোক বেশি চলাচল করবে না। কারণ দোকানপাট নেই। কেবল বাড়ি আর ফ্ল্যাট। মোটামুটি একটু ফাঁকা পেলেই পেছন থেকে গুলি করবে রাধু মাহাত। ঢুক করে একটা শব্দ হবে। নয়না রবাবী খতম।

না হলে বেঁচে যাবে এবারের মত। তবে রাধু মাহাতর মনে হচ্ছে গলিতে ঢুকলেই নয়না রবাবী আজ খত্তম।

১০

পরদিন সকাল দশটা নাগাদ একটা গাড়ি থেকে তিনবন্ধুকে নামতে দেখা গেল সেই ফ্ল্যাটবাড়ির সামনে যেখানে নয়না রবাবীকে পাওয়া যাবে। সিকিউরিটিতে থাকা ছেলেটি ঋতমকে চেনে। সে হাসিমুখে বলল, 'বলেন দাদা! আপনি তো এখন আর থাকেনই না।'

'আজ থেকে থাকব।' হাসিমুখে জানাল ঋতম। 'উল্টো দিকের ফ্ল্যাটের ভাড়াটে কি আছেন?'

'হ্যাঁ। তবে সেই লোকটা আর আসে নি। আমি তাই আপনাকে ফোন করি নি।'

'শুনলাম ওই নয়না রবাবী বাইরে গেছিলেন দিন কয়েকের জন্য?'

'না তো দাদা! আমার তো দিনের ডিউটি চলছে। রাত্তির আটটা পর্যন্ত। উনি তো খুব একটা বেরোন না। বেরোলে সন্ধের পর পর ফিরে আসেন।'

'ঠিক আছে।'

ঋতম লিফটের দিকে এগিয়ে গেল। হিমেশ ফিসফিস করে বলল, 'তার মানে শি হ্যাজ বিন হেয়ার।'

লিফটের দরজা বন্ধ হওয়ার পর ঋতম বলল, 'ঠিক যা প্ল্যান হয়েছে, সে ভাবে চলব। স্টার্ট ক্যাজুয়ালি।'

ঠিক হয়েছে যে ঋতম তাঁর ফ্ল্যাটে অনেক দিন পর আসছে। কৌতূহল বশত সে দেখতে গেছে উল্টো দিকের ফ্ল্যাটে কে এসেছে। তখন যদি নয়না রবাবী বেরিয়ে আসে তবে তাঁরা খুব অবাক হওয়ার ভান করবে।

সেই প্ল্যান মনে মনে আরেকবার ভেবে নিয়ে ওরা মাথা ঝাঁকিয়ে সম্মতি জানাল ঋতমের কথায়।

লিফট থেকে বেরিয়ে ঋতম ডান দিকে তাকাল। সামনের করিডোরে পা রাখলেই মুখোমুখি ফ্ল্যাট দুটোর দরজা চোখে পড়বে। নয়না রবাবীর ফ্ল্যাটের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ওরা তিনজন পরস্পরের দিকে তাকাল। হিমেশ ইঙ্গিতে কলিং বেলের বোতাম টিপতে বলল ঋতমকে।

বেল বাজার পর বেশ কয়েক সেকেন্ড কোনও সাড়া মিলল না। তারপর খুট করে একটা শব্দ। দরজাটা খুলছে। প্রত্যাশা মতই নয়না রবাবী মুখ দেখা গেল দরজার ফাঁকে। তাঁর দু-চোখে বিস্ময় ফুটে উঠল এবার।

'মাই গড! হোয়াটা সারপ্রাইজ!' নয়না রবাবী বিস্মিত হলেও মুখে ঝলমল করছে হাসি।

'আমরাও সারপ্রাইজড্।' হাসিমুখে, চোখে বিস্ময় খেলিয়ে বলল ঋতম। 'অ্যাকচুয়ালি আমার ফ্ল্যাট হল জাস্ট অপোজিট টু ইওর এন্ড দিস ফ্ল্যাট বিলংস টু মাই নোওন্।'

'মাই গড! প্লিজ—।' দরজাটা খুলে দিল নয়না রবাবী। হাফ প্যান্ট আর কিছুটা খোলা টি শার্টে তাঁকে এতটাই উত্তেজক দেখাচ্ছিল যে তিনজন পলকের জন্য থমকে গেল।

'আপনি তো দার্জিলিং-এ ছিলেন বললেন গতকাল?'

ফ্ল্যাটটা ঋতমের ভালমত চেনা। ডান দিকে ড্রইং রুম। সে ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বলল সে। নয়না রবাবী ঘরের আলো জ্বেলে দিয়ে এসি চালিয়ে দিয়ে ওদের মুখোমুখি একটা বেতের চেয়ার বসে হাসিমুখে বলল, 'আমি তো এর মধ্যে বাইরে যাই নি। ইন ফ্যাক্ট আই হ্যাভ বিন হিয়ার ফর ফিউ ডেজ।'

হিমেশ একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিল নয়না রবাবীর দিকে। এবার সে জিগ্যেস করল, 'বাট ইউ টোল্ড মি সো হোয়েন আই ফোনড্ ইয়েসটার্ডে?'

'মী?' দু-চোখ বড় করে তাকাল নয়না রবাবী। তারপর খিল খিল করে হেসে ফেলল। 'স্যার— ডিড্ ইউ প্লে দ্য গেম লাস্ট নাইট?'

হাসির কারণে নয়না রবাবীর বুক দুটো কাঁপছিল। সেদিক একবার চোখ বুলিয়ে হিমেশ শান্ত গলায় বলল, 'ঋতম অলসো ফোনড্ ইউ এন্ড ইউ টোল্ড হিম দ্য সেম— আপনি দার্জিলিং-এ!'

'ডু ইউ লাইক কোল্ড ড্রিঙ্কস?' হাসিমুখে, সহজ গলাতেই জিগ্যেস করল নয়না রবাবী। 'দার্জিলিং-এর কথা কী বলছেন জানি না, বাট ইউ ফোনড্ ডে বিফোর ইয়েসটার্ডে অ্যাজ আই রিকল্। ইউ হ্যাড আ প্রবলেম উইদ ডাইনলোড।'

রাধু মাহাত ফোন করল ঋতমকে। 'নায়না রাবাবী আভি শেল্লোগোড়ি থিকে ফিরল।' তারপর ফোনের ঢাকনা খুলে সিমকার্ডটা বের করে ভেঙে ফেলে দিল পাশের নর্দমায়। তারপর খানিকটা দূরত্ব বজায় রেখে অনুসরণ করতে লাগল নয়না রবাবীকে। বাস স্ট্যান্ড থেকে ওর ফ্ল্যাট পর্যন্ত রাস্তাটা রাধু মাহাতর চেনা হয়ে গেছে। হেঁটে যেতে মিনিট পনের লাগে খুব জোর। গলিতে ঢুকলেই সে একটা চান্স নেবে। নয় তো দেখে আসবে ফ্ল্যাটেই গেল কি না।

'আপনি দার্জিলিং থেকে ভিডিও কল করেছিলেন এন্ড আই হ্যাভ দ্য রেকর্ডিং!' হিমেশ মনে মনে বিচলিত হলেও শান্ত স্বরেই বলল।

'প্লিজ, শো দ্যাট ভিডিও দেন আই উইল এক্সপ্লেইন।'

হিমেশ পকেট থেকে মোবাইলটা বের করে আঙুল বোলাতে লাগল। কয়েক সেকেন্ড নীরবতা। দেখা গেল হিমেশের ভুরু কুঁচকে গেছে। কারণ ভিডিও কলের রেকর্ডিং খুঁজে পাচ্ছে না সে। অথচ সেটা ছিল।

'মনে হয় আমি আপনাদের প্রবলেমটা বুঝতে পেরেছি স্যার। ফোনটা রেখে দিন। আই ওয়ান্ট টু টেল ইউ সামথিং টেকনিক্যাল।'

'আপনি দার্জিলিং-এ ছিলেন না?' ঋতম বলল এবার। 'তবে আমরা কার সঙ্গে কথা বললাম?'

'এটা পার্ট অফ গেম। আ সাইড এফেক্ট। আপনারা ভেবেছেন যে আমার সঙ্গে কথা হয়েছে।'

'ডোন্ট ট্রাই টু মিসগাইড।' ঠান্ডা গলায় কেটে কেটে বলল হিমেশ। 'আমরা লাস্ট থার্টি সিক্স আওয়ার্স গেমটা খেলি নি।' বলতে বলতে উঠে দাঁড়াল। নয়না রবাবীর সামনে গিয়ে ঝুঁকে পড়ে ফিসফিস করে বলল, 'উই আর ব্যাড গাইজ মিস্ রবাবী! জাস্ট টেল মি হু আর ইউ এন্ড হোয়াট ফাকিং প্ল্যান ইউ মেড?'

নয়না রবাবী খুব শান্ত গলায় বলল, 'ইউ ডাউনলোডেড স্যার।'

'ডাউনলোডেড হোয়াট?'

'লেট মি এক্সপ্লেনইন।'

'এক্সপ্লেইন ইন ফাইভ মিনিটস্।' ফিসফিস করেই বলল হিমেশ। তারপর ফিরে এসে আবার বসল। নয়না রবাবী কয়েক সেকেন্ড মেঝের দিকে তাকিয়ে থাকল। যেন কিছু ভাবছে। হিমেশ সিগারেট বের করে ধরাল। ধোঁয়া ছাড়ল খানিকটা। শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষে সে ধোঁয়া পাক খেতে খেতে ঘুরে বেড়াতে লাগল আপন মনে।

'জাস্ট লুক এট দ্য স্মোক।' নয়না রবাবীর গলা শোনা গেল। সঙ্গে সঙ্গে তিনজনের চোখে নিবদ্ধ হল পাক খাওয়া সাদা ধোঁয়াটার দিকে। সেটা তখন মিলিয়ে যাচ্ছিল।

'ডু ইউ রিস্টোর দ্যাট স্মোক?' নয়না রবাবী তিনজনের দিকে একবার তাকিয়ে প্রশ্নটা করল। 'ইয়েস, ইউ ক্যান।' কয়েক সেকেন্ড অপেক্ষা করে নিজেই দিল জবাবটা। 'অল সিকোয়েন্স আর ডাউনলোডেব্ল্— ইভ্ন এনি ইমাজিনারি সিকোয়েন্স। ডু ইউ আন্ডারস্টান্ড স্যার?'

'গো অন।' হিমেশ স্থির চোখে তাকিয়ে থেকে বলল। 'পাঁচ মিনিট এখনও হয় নি।'

'গেমটা খেলার সময় আপনারা যে ডাউডলোড করেছিলেন সেটা আপনাদের ইমাজিন থেকে ফর্ম করেছিল। মে আই নো আপনারা সাবকন্সাসে কাকে ইমাজিন করেছিলেন?'

'ডু ইউ?'

'ইয়েস স্যার।'

'দেন টেল দ্য নেম।'

'ব্যালেরিনা গুরুং।'

কয়েক সেকেন্ড তিনজন পাথর হয়ে গেল। তারপর শোনা গেল হিমেশের চাপা গর্জন। পকেট থেকে নাইন এমএম পিস্তলটা বের করে এক লাফে নয়না রবাবীর কপালে সেটা ঠেকিয়ে সে বলছে, 'ইয়েস ইউ ফাকিং গেম প্ল্যানার! ইউ আর রাইট! নাউ জাস্ট টেল মি হু আর ইউ?'

অবিচলিত নয়না রবাবী মৃদু গলায় বলল, 'আয়াম নট শুটেবল্ স্যার। আয়াম অলসো ডাউনলোডেড আইটেম।'

'হাউ ডু ইউ ফিল গেটিং ডিলিটেড?'

'ডু ইউ সেক্স উইদ মি স্যার?'

হিমেশকে হতবাক্ করে দাঁড়িয়ে পড়ল নয়না রবাবী। পলকের মধ্যে টি শার্টটা শরীর থেকে বের করে এনে মেঝেতে ফেলে দিল সে। নগ্ন বুকে দু-হাত দু-দিকে ছড়িয়ে ফিসফিসে স্বরে বলল, 'টাচ মি।'

পিস্তলটা নয়না রবাবীর বুকে কাঁপা কাঁপা হাতে ঠেসে ধরতেই সেটা বুক ভেদ করে পিঠ দিয়ে বেরিয়ে গেল যেন। হিমেশের মনে হল সে হাওয়ার মধ্য ঠেসে দিয়েছিল পিস্তলের নল।

নয়না রবাবী যেন খুব মজা পেয়েছে। খিল খিল করে হাসতে হাসতে প্যান্টটা খুলে ফেলল সে। এবার বিস্ময় আর আতঙ্কে হিম হয়ে গেল তিনজন। নয়না রবাবীর নগ্ন শরীর নাভির একটু নিচ থেকে কয়েক ইঞ্চি অদৃশ্য। প্যান্ট থাকার জন্য বোঝা যায় নি।

'সরি স্যার। ডাউনলোড এরর।' সেই শূন্যস্থানের দিকে তাকিয়ে একটু লজ্জা পেয়ে বলল নয়না রবাবী। 'তারপর এক এক করে প্যান্ট-জামা পরে নিয়ে বেতের

আগামী সংখ্যা থেকে শুরু হচ্ছে ধারাবাহিক

উত্তরের উপকথা

এ কথা সত্যি, ডুয়ার্স মানে কেবল চোখ জুড়নো সবুজ বা পাহার ঝোড়ার রহস্য নয়, ডুয়ার্স একটি বিশাল জনজীবনও বটে। সে জীবনের রঙ্গীন সুখ বা বিবর্ণ কষ্টের চড়াই উতরাইয়ের বাঁকে বাঁকে ছড়িয়ে রয়েছে সে সব লোককথা।

বাঙালি অবাঙালি আদিবাসি নারী-পুরুষ তৃতীয় লিঙ্গ পতিতা সামন্ত অস্পৃশ্য ফোকলোকের মুখে বেঁচে থাকা ১০টি পুরাণ রূপকথা-মিথ-কিংবদন্তী ইত্যাদি লোকগল্প এবং সেগুলি জোগাড় করার অভিজ্ঞতার ঝুলি উপুড় করে দেবেন **সুচন্দ্রা ভট্টাচার্য**।

জুলাই ২০১৯ সংখ্যা থেকে 'এখন ডুয়ার্স'-এর পাতায় প্রতি সংখ্যায়।

এখন ডুয়ার্স

চেয়ারে ফের বসল আগের মত। 'আসলে আমরা যে ওয়ার্ল্ডে থাকি, সেখান থেকে এই ওয়ার্ল্ডে আসা যায় না। সো ডাউনলোড ইজ দ্য অনলি ওয়ে।'

হঠাৎ সম্বিৎ ফিরে পেয়ে বিনায়ক চিৎকার করে বলল, 'ভাগ ইয়ার! দে আর ঘোস্ট—!'

'ডোন্ট ইউ ফাক মি স্যার?' বিনায়কের দিকে তাকিয়ে হাসিমুখে জানতে চাইল নয়না রবাবী।

বিনায়ক দু-পা পিছিয়ে গেল। আরেকটু পেছলেই দরজা। তারপর ভাগবে সে। একবার আড়চোখে ঋতমের দিকে তাকাল। ঋতম কি ঘুমোচ্ছে?

'ঋতম ইজ মাইন।' নয়না রবাবী বেতের চেয়ার বসে আস্তে আস্তে দুলছে। 'আই ক্যাপচার্ড হিম। ও আমাকে ভালবাসত। ভালবাসলে খুন করা যায়। ইউ হ্যাভ রাইট টু কিল হুম ইউ লাভ। দিজ ইজ অলসো ক্রাইম, বাট ফেয়ার।'

বিনায়ক নড়তে পারছে না। চেয়ারে বসেছিল নয়না রবাবী। এখন সেখানে ব্যালেরিনা গুরুং।

'বাট ইউ রেপড্ মি। ভেরি আনফেয়ার। আই ওয়জ ইওর ফ্রেন্ডস্ গার্লফ্রেন্ড। ঋতম কি আমাকে রেপ করতে বলেছিল?'

বিনায়ক কিছু বলতে চাইল। পারল না। কিন্তু সে দেখল দাঁড়িয়ে থাকা হিমেশের পিস্তল ধরা হাতটা ধীরে ধীরে উঠছে।

'উড ইউ লাইক টু রেপ মি এগেইন?'

একটা কান ফাটান শব্দ। গুলি চালিয়ে দিয়েছে হিমেশ। চেয়ারে বসে থাকা ব্যালেরিনার মাথার পেছনের দেয়ালে একটা গর্ত হয়ে সিমেন্ট আর ইটের টুকরো ছিটকে বেরিয়ে এল।

'আয়াম আনশুটেবল্ স্যার।'

বিনায়ক চোখ বন্ধ করে ফেলেছিল। সেই অবস্থাতেই শুনল ব্যালেরিনা গুরুং-এর গলা। তারপর সব নিস্তব্ধ। বিনায়ক টের পেল সে নড়তে পারছে। সে চোখ খুলল। হিমেশ ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে তাঁর দিকে। হাতে নাইন এমএম। সোফায় একটু হেলে ঘুমোচ্ছে ঋতম। ঘরে আর কেউ নেই।

'ঋতম ইজ ডেড!' হিমেশ ফিসফিস করে বলল।

বিনায়ক চারদিকে তাকাল। দেয়ালে গুলির গর্ত। ঘরের কোণায় ভেতরে যাওয়ার দরজাটা একটু খোলা। সে আঙুল তুলে সেদিকে হিমেশের দৃষ্টি ফেরাল। হিমেশ সেদিকে পা টিপে টিপে এগিয়ে গেল পিস্তল উঁচিয়ে। তারপর হ্যাঁচকা টানে দরজাটা খুলে দিল পুরো।

ওপাশে একটা ঘর। কার্পেট বিছান মেঝেতে পড়ে আছে রাধু মাহাত। চোখ দুটো খোলা। প্রাণহীন। ঘরময় ভেসে বেড়াচ্ছে হালকা শীৎকার। হিমেশ তাকাল ঘরের কোণায় বিছানাটার দিকে। দুটি নগ্ন শরীর চূড়ান্ত মিলনে উন্মত্ত। তাঁদের আর কোনওদিকে খেয়াল নেই। হিমেশ মন্ত্রমুগ্ধের মত এগিয়ে গেল বিছানার দিকে। না। কোনও ভুল নেই। ওরা ঋতম আর ব্যালেরিনা।

পিস্তলটা ওদের দিকে তাক করে ম্যাগাজিন খালি করে দিল হিমেশ। কিন্তু সঙ্গম থামল না। চলতেই লাগল।

ফ্ল্যাটের বাইরে তখন প্রবল চিৎকার চ্যাঁচামেচি। পুলিশে ফোন গেল। কারা জানি গুলি চালাচ্ছে।

১১

সদর থানার আইসি-কে বসতে বলে পুলিশ সুপার কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলেন। তারপর একটু হেসে বললেন, 'আপনার রিপোর্ট পড়েছি। আপনারা ফ্ল্যাটের দরজা ভেঙে ভেতরে ঢুকে দুটো লোককে পান। তাঁদের একজনের কাছে পিস্তল ছিল। থার্ড যে ছিল সে মরে পড়েছিল মেঝেতে। অটোপ্সির রিপোর্ট অনুযায়ী সে মারা গেছিল দশ-বারো ঘণ্টা আগে। হার্ট অ্যাটাকে। হিমেশ নামের লোকটি মোট ছ-টা ফায়ার করেছিল। কিন্তু একটা গুলি পাওয়া গেছে বসার ঘরের দেয়ালে আর বাকি পাঁচটা ভেতরের ঘরের বিছানা ফুটো করেছে। ফাঁকা বিছানায় গুলি করার ঘটনা আমি আগে শুনি নি। ছেলে দুটোর জামিন না হওয়ার কোনও কারণ দেখছি না।'

আইসি বললেন, 'ইয়েস স্যার।'

'দরজা ভেতর থেকে বন্ধ ছিল এন্ড মোস্ট পিকিউলিয়ার ব্যাপার হল সেই ফ্ল্যাটে যে মেয়েটি ভাড়া থাকত সে ভ্যানিশ!'

বিনায়ক চারদিকে তাকাল। দেয়ালে গুলির গর্ত। ঘরের কোণায় ভেতরে যাওয়ার দরজাটা একটু খোলা। সে আঙুল তুলে সেদিকে হিমেশের দৃষ্টি ফেরাল। হিমেশ সেদিকে পা টিপে টিপে এগিয়ে গেল পিস্তল উঁচিয়ে। তারপর হ্যাঁচকা টানে দরজাটা খুলে দিল পুরো। ওপাশে একটা ঘর। কার্পেট বিছান মেঝেতে পড়ে আছে রাধু মাহাত। চোখ দুটো খোলা। প্রাণহীন। ঘরময় ভেসে বেড়াচ্ছে হালকা শীৎকার।

'ইয়েস স্যার।'

'আপনি কি বলতে পারেন ঠিক কী হয়েছিল সেখানে?'

'নো স্যার। ছেলে দুটোর কথা শুনে মনে হচ্ছে ওদের চিন্তা ভাবনায় ডিসঅর্ডার আছে। আপনি কখনও ডাউনলোড হওয়া মানুষের কথা শুনেছেন?'

সুপার কিছুক্ষণ ছাদের দিকে তাকিয়ে থাকলেন। তারপর বললেন, 'সিএম আসছেন পরশু। আমাকে বের হতে হবে। ছেলে দুটোর জামিনের দিন কোর্ট আপনাকে ভালই চাটবে। ডেড বডিটা আইডেন্টিফায়েড হল?'

'আধার কার্ড যেটা পাওয়া গেছে সেটা ফেক।'

'আপনি এখন যেতে পারেন। আর শুনুন—!'

'ইয়েস স্যার!'

'মানুষ ডাউনলোডের ব্যাপারটা যেন প্রেসের কানে না যায়। ব্যাপারটা মন্দ নয়। আমার শ্যালিকা ভূতের গল্পো লেখে। থিমটা ওকে দিয়ে দেব। মিডিয়ায় বেরিয়ে গেলে অন্য কেউ লিখে ফেলতে পারে, বুঝেছেন?'

'ইয়েস স্যার!'

(সমাপ্ত)

ডুয়ার্স আজও মেয়েবেলার সেই ম্যাজিক ল্যাম্প

মেয়েবেলা— আমি মেয়ে বলে মেয়েবেলা নাকি আমি ছোট ছিলাম বলে সেই ছোটবেলা? আমার মেয়ে থেকে কিশোরী জীবন ছুঁয়ে নারীতে উত্তরণ এবং পরবর্তীতে 'মাতৃরূপেণ সংস্থিতা' হয়ে ওঠার এক পরিপূর্ণ জীবন যাত্রায় কিন্তু সেই ছোট্ট মেয়েটা ডুয়ার্সের আনাচকানাচে এখনও রয়ে গিয়েছে। ডুয়ার্স আমি ছুঁয়ে থাকি সবসময়— আমার মেয়েবেলা তাই আজও বিদ্যমান। আমি বরং আমার ছোটবেলার গল্প অল্পস্বল্প শোনাই। আমি পশ্চিম ডুয়ার্সের বৈচিত্র্যময় ভূপ্রকৃতিতে জন্মেছি, বড় হয়েছি। এখানে বলে রাখি পশ্চিম ডুয়ার্স হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহার। এবার ছোটবেলা যার ডুয়ার্সের কোলে কেটেছে, তার ছোটবেলা এমনিতেই স্বর্গীয় অনুভূতিতে ভরপুর। প্রকৃতির অমলিন সৌন্দর্যকে স্পর্শ করে, বৃষ্টি ভেজা তিস্তা— করলার রূপ, রস আস্বাদন করা ছোটবেলা ছিল যেন আস্ত এক রূপকথা। ছোটবেলার কথা লিখতে বসে হাজার হাজার স্মৃতি ভিড় করে আসে। আমার ছোটবেলা মানেই হল দুরন্তপনায় ভর্তি। পড়াশোনার পাশাপাশি বাকি সমস্ত সময়টা খেলাধুলো, দৌড়দৌড়িতে কেটেছে। ঘুম ভাঙত নানারকম পাখির কিচিরমিচিরে। সোম থেকে শনি এক সুখকর অধ্যায় ছিল স্কুলজীবন। কিন্তু তার থেকেও সুখকর অধ্যায় ছিল রবিবারের দিনগুলি।

"সোম মঙ্গল বুধ এরা সব আসে তাড়াতাড়ি,
এদের ঘরে আছে বুঝি মস্ত হাওয়া-গাড়ি?
রবিবার সে কেন, মাগো, এমন দেরি করে?
ধীরে ধীরে পৌঁছয় সে সকল বারের পরে।"

কবিগুরুর এই ছড়া হাড়ে হাড়ে মজ্জায় মজ্জায় এখন যতটা বুঝতে পারি, ছোটবেলা থেকে বড়বেলা— অর্থাৎ যতদিন ছাত্রীজীবন ছিল, মোটেও কিন্তু রবিবারের ছুটির সেই মজাটা সে ভাবে ছিলোই না, উল্টে পড়াশোনার চাপের আতঙ্কছিল। ছোটবেলায় খেলাধুলো বলতে সকালবেলা মোটে দু'ঘণ্টা মানে ওই সকাল দশটা থেকে বারোটা অবধি বরাদ্দ ছিল। আবার বিকেলে বরাদ্দ ছিল সাড়ে চারটে থেকে ছ'টা। যদিও পুষিয়ে নিতাম পড়ার বইয়ের ভেতর টিনটিন, নন্টেফন্টে, হাঁদাভোঁদা, বাঁটুল দি গ্রেট এবং নানারকম গল্পের বই লুকিয়ে পড়ে। আর যদি সময়টা হত বর্ষাকাল— তাহলে তো সোনায় সোহাগা। আমাদের বাড়ির উল্টো দিকের মাঠ লাগোয়া একখানা পুকুর ছিল। বৃষ্টি নামলেই ইয়াব্বড় একখানা মানকচু পাতাকে ছাতা বানিয়ে মাথায় চাপিয়ে পুকুরে কতটা জল বাড়ল, তা চোখ দিয়ে মাপতে বসতাম। বাবা-মায়ের শাসনের শব্দদূষণ নিচের ডেসিবেল থেকে উপরের ডেসিবেলে পৌঁছে যেত— কিন্তু আমি তখন জল থইথই শাপলা ভরা পুকুরটার অলিখিত মালকিন। আমার কি তখন আর পুকুর ছেড়ে বাড়িতে চুপটি করে বসে থাকা মানায়? আবার গরমের ছুটির দিন মানেই আমার আর কোলবালিশের জন্মজন্মান্তরের প্রেম। যদিও তাতে মা কিলোখানেক বালি ফেলে সকাল ছ'টায় তুলে দিতেন পড়তে বসার জন্য। রবিবার মানেই বাবা এক জাগতিক সুখে বিগলিত মুখ করে যেতেন বাজারে রবিবাসরীয় মাংস কিনতে। রবিবারের সকালটা আরও একটি কারণে বড় প্রিয় ছিল। ঘিয়ে ভাজা লুচি আর

আমরা যারা ডুয়ার্সে বড় হয়েছি, তারা জানি সাইকেল নিয়ে শহর লাগোয়া চা-বাগানগুলোতে চক্কর লাগানো কী পরিমাণ নেশা ছিল। সব ঋতুতেই চা-বাগানে কচি সবুজের ঝলক আছড়ে পড়ে মহাসমারোহে। তবে বর্ষায় চা-পাতাগুলো যেন বৃষ্টির জল মেখে আরও সবুজ হয়ে ওঠে। চা-বাগানেরপাশ দিয়ে যে রাস্তা গিয়েছে, সেটা ধরে অনেকটা এগিয়ে চলে যেতাম সবুজের সমুদ্র দেখতে দেখতে।

কালোজিরে ফোঁড়ন দিয়ে আলু চচ্চড়ির লোভাতুর গন্ধ রান্নাঘর থেকে পড়ার ঘর অব্দি ভেসে আসত— আহা সেদিন কে সি নাগের বাঁদরও সোনাছেলে হয়ে দাঁত খিঁচানো বন্ধ করে নিজেই তেলমাখা বাঁশের মাথায় সুড়ুত করে চড়ে বসত, মোটেও পিছলে পড়ত না। আমি আর ভাই গুণগুণ করে গাইতাম 'মোরা খাই দাই ঘুরি ফিরি, আহা কী মোদের ছিরি।'

আমরা যারা ডুয়ার্সে বড় হয়েছি, তারা জানি সাইকেল নিয়ে শহর লাগোয়া চা-বাগানগুলোতে চক্কর লাগানো কী পরিমাণ নেশা ছিল। সব ঋতুতেই চা-বাগানে কচি সবুজের ঝলক আছড়ে পড়ে মহাসমারোহে। তবে বর্ষায় চা-পাতাগুলো যেন বৃষ্টির জল মেখে আরও সবুজ হয়ে ওঠে। চা-বাগানেরপাশ দিয়ে যে রাস্তা গিয়েছে, সেটা ধরে অনেকটা এগিয়ে চলে যেতাম সবুজের সমুদ্র দেখতে দেখতে। বাড়ি যখন ফিরতাম তখন মাথার চুলে বাবুই পাখি অনায়াসে বাড়ি বাঁধতে পারত। রবিবারে আরও যে ক'টা নেশা ধরান আনন্দ ছিল, তার মধ্যে অন্যতম ছিল ডাংগুলি, গোল্লাছুট। খেলার পর বাড়ি এসে স্নানে যাবার আগের মুহূর্তটা ছিল অসাধারণ। প্রেসার কুকারে সেই সময় মা কচি পাঁঠার মাংস কষিয়ে ঢাকা এঁটে দিত। আর তারপর হুইসিলের শব্দের সাথে সাথে মাংসের গন্ধে সারা বাড়ি ম-ম করে উঠত। আহা কী স্বর্গীয় সুবাস। দুপুরে খেতে বসার সময় বাবা রেডিওতে তখন বাংলা আধুনিক গানের অনুরোধের আসর চালাতেন। আমাদের একটা মার্ফি রেডিও ছিল, ছোট, জালি দেওয়া। খেতে বসার আগে বাবা সেই রেডিওতে অনুরোধের আসর ধরতেন। গান শুনতে শুনতে চলত আমাদের দুপুরের খাওয়া— গরমভাত, কালোজিরে-পেঁয়াজ-শুকনোলঙ্কা ফোঁড়ন দেওয়া মুসুরির ডাল, কুড়কুড়ে আলুভাজা আর কচি পাঁঠার মাংসের ঝোল, তাতে বেশ বড় আধখানা আলু, সঙ্গে টম্যাটো বা আমের চাটনি। মাকে মোটেও বলতেই হত না 'কী হল তাড়াতাড়ি খেয়ে নাও, ভাত তো মোটেই মুখে উঠছে না দেখছি।' সোনামুখ করে চেটেপুটে সবটুকু খাবার খেয়ে উঠেই বিছানায় ঝপাং।

রবিবারের দুপুর আমার বাবাকেও বেশ আমুল বাটারের মত নরম করে দিত। মা ভাইকে যখন গল্প বলছে ঘুম পাড়ানোর জন্য, আমি তখন বাবার চুলে চিরুনি চালিয়ে অগুন্তি ঝুঁটি বাঁধতে ব্যস্ত। আর বাবাও বেশ ভাল বাচ্চার মত মাথা পেতে ঝুঁটি বাঁধতে দিতেন। সন্ধেবেলায় কখনও কখনও উপরি পাওনা হিসেবে বাবা আমাদের রেকর্ড প্লেয়ারে রেকর্ড বাজিয়ে শোনাতেন। একমাত্র সেইদিন মা আমাদের দুগ্ধপোষ্য না ভেবে বেশ ঝাল ঝাল স্ন্যাক্স বানিয়ে খাওয়াতেন, সঙ্গে বেশ গরম গরম আদা চা বা কফি। মাকে তখন দুগগা মা লাগত। জাপটে ধরে চকাশ করে চুমু খেলেই পাল্টা আদর খেতাম আমরা দুই ভাইবোন। রবিবারটা তখন বেশ একরাশ সুখ মনে হত। ডুয়ার্সের কচি সবুজের সঙ্গে ঘন সবুজ আজও ম্যাজিক ল্যাম্প আমার কাছে, যার আকাশটা ঝকঝকে নীল, আর তিস্তা নদী প্রথম প্রেম।

মৌসুমী ভৌমিক

পরানে কী হাতুড়ি বাজে রে

ঘোষক: রেডিও পরলোকসভা। শুরু হচ্ছে প্রাজ্ঞ ব্যক্তিদের কথালাপের অনুষ্ঠান 'প্রাণে কী হাতুড়ি বাজে'।

বিদ্যাসাগর: আমার মূর্তি ভাঙার কথাটা শুনেছেন তো?

রামকৃষ্ণ: কী দিয়ে ভেঙেছে র‍্যা? কলসির কানা? প্রেম দিবি নে তা বলে?

ডিরোজিও: কোথায়? ক্যালকাটায়? আচ্ছা, ক্যালকাটা কি এখনও কলোনি?

বিবেকানন্দ: ব্যাপারটা ইন্টারেস্টিং। মূর্তি কোথায় ছিল?

বিদ্যাসাগর: মম নামাঙ্কিত মহাবিদ্যালয়ে।

দাদাঠাকুর: অ। তাই বলুন। বিদ্যা যথা মহানন্দ লয় হইতেছে ইতি মহাবিদ্যালয়।

বেদব্যাস: তোর নামে কলেজ বানিয়েছিল নাকি ইশ্ব? কারা বানায়? বানায় তো ভেঙে দেয় না কেন?

রবীন্দ্রনাথ: অহো! তোমার কথা বোঝার আশায় দিয়েছি জলাঞ্জলী। আজকাল তুমি এত রহস্য করো কেন?

চন্ডীদাস: মনে হয় ব্যানার্জি পদবী ভেবে ভুল হয়েছে। তদুপরি তিনি নিজের ছবির সঙ্গে আপনাদেরটা লাগিয়ে প্রচার করেন। আপনাকে মনে হয় দলদাস ভেবেছিল।

বিদ্যাসাগর: তবে তো ধরে নিতে হয় এটা পদ্মপুষ্পের কাজ। এর বিপক্ষে কেউ কিছু বলবেন?

ডিরোজিও: ভেজিটারিয়ানরাও করতে পারে—।

বিদ্যাসাগর: ভেজ নয় ডিরু, ফ্লাওয়ার অফ গ্রাস। হ্যাঁ, তাঁরাও করতে পারে।

রামকৃষ্ণ: তুই শালা কারোর না।

রবীন্দ্রনাথ: যে কখনওই কাহারো ছিল না তাঁকে ভাঙার অধিকার সকলের। সমষ্টি তাঁকে ভাঙবে ঠিকই, কিন্তু পরে আবার সমষ্টিই তাঁকে গড়ে তুলবে পঞ্চ-অষ্ট ধাতুর সমন্বয়ে।

বিবেকানন্দ: তবে সিদ্ধান্ত কী হল? মূর্তি কেউ ভাঙেনি?

বেদব্যাস: তোদের কি ধারণা মূর্তি আছে বলে তোরাও আছিস?

চন্ডীদাস: কী যে বলেন? মনে রাখার জন্যই তো মূর্তি বানায়।

নর্মাল বেথুন: ভুল কহিটেছ। মুর্টি হইল সটর্কিকরণ। কাহাকে কাহাকে কাজের টাইমে ভুলিয়া জাইটে হইবে টাহা মুর্টি মোনে করাইয়া ডিবে।

মাইকেল: হাঃ হাঃ হাঃ!

বিবেকানন্দ: এই তো। মধুদা এসে গেছে। খবর শুনেছ?

মাইকেল: হাঃ হাঃ হাঃ! যে জাতি ইংরেজি পোশাক পরে নিজেকে আধুনিক ভাবে তাঁরা কি জানে সে জাতির সব চে' বড় আধুনিক ধুতি-চাদর পরতেন? তা ছাড়া মূর্তি ভেঙে ফেলা বাঙালির অভ্যেস। হায় রে মুরতি তুই, নাহি দাম, সারা হলে পূজা, ফেলে দেয় যেন বাতিল সিম কার্ড! বিদ্যাসার গন্। আমরা সবাই গন্। হাঃ হাঃ হাঃ! এই বাংলায় আমার কদর নেই, কেবল কবর আছে। লোকে সেটা দেখা আর ভাবে, মধুকবি বিখ্যাত কারণ তাঁকে এখানে কবর দেওয়া হয়েছিল। হাঃ হাঃ হাঃ!

বিদ্যাসাগর: দারুণ বলেছেন! কিন্তু প্রশ্ন হল, কারা ভাঙল?

ব্যোমকেশ: আপনাদের গোড়া থেকে একটা ভুল হচ্ছে। ভাঙে নি। ভেঙে পড়েছে।

রবীন্দ্রনাথ: নাহি যদি ভাঙে পড়িবে কী ভাবে অসীম চরণতলে?

ব্যোমকেশ: ভাঙনটা মূর্তির ভেতরেই ছিল। সেদিন বেরিয়ে এসেছিল মাত্র।

চন্ডীদাস: যেমতি কাহ্ন বিরাজে রাধার মাঝে?

ডিরোজিও: আপনাকে আগেই ভেঙে ফেলেছিল বুঝলেন? মূর্তিটা গোটা হলেও ভেতরে যে আপনি ছিলেন, সেটা ছিল ভাঙা।

রবীন্দ্রনাথ: এ কথা কি আমার মূর্তির ক্ষেত্রেও সত্য? এ কি সত্য? সকলই সত্য?

বেদব্যাস: দূর মশাই! প্যান প্যান করে গান গাওয়া বাদে আর কী নিয়েছে আপনার থেকে বলুন তো? আপনি এখনও ড্রইং রুমে। বাকি বাঙালি জানে আপনিও একটা মূর্তি।

নজরুল: অমর কাব্য তোমরা লিখিও বন্ধু যাহারা আছ সুখে।

রবীন্দ্রনাথ: হায়! মনে হচ্ছে আমার নামে যা কিছু আছে সব ভেঙে দিয়ে আসি! আপনারা কেউ থাকবেন আমার সাথে?

রামকৃষ্ণ: ডাক শুনে তো কেউ এলো না! তবে একলাই যা।

দাদাঠাকুর: যান গুরুদেব! ভেঙে আসুন। এরপর যখন পলিটিকালি ভাঙবে, তখন দুখের শেষ থাকবে না।

মার্কস: আপনার যে ক' পার্সেন্ট আছে, সুইং করে বাল্মিকীর কাছে চলে যাবে।

মাইকেল: আপনার শান্তিনিকেতন গম্মেন্ট সংখ্যালঘু হয়ে যাবে।

চন্ডীদাস: আপনার মানস সুন্দরী হয়ে যাবে অনুপ্রেরণার ফসল।

বিবেকানন্দ: ভেবে দেখুন, আপনি বেম্ম। বেম্মরা কি মূর্তির উপাসক?

রবীন্দ্রনাথ: যাচ্ছি! এই যাচ্ছি ভাঙতে—!

বিদ্যাসাগর: না না! আপনি উত্তেজিত হবেন না। আপনার মুখ লাল, চুল তামাটে হয়ে গেছে।

রবীন্দ্রনাথ: হা রে রেরে রেরে তোরা ছেড়ে আমায় দে রে!

(প্রচণ্ড হট্টগোল। বিধাতা তাড়াতাড়ি মাইক্রোফোন অফ করে দিলেন। সহসা সব চুপচাপ। ব্ল্যাকহোলের নীরবতা। সেই নীরবতা ভেঙে শোনা গেল—)

রাবণ: (সমবেত কণ্ঠে) ইতনা সন্নাটা কিঁউ?

ঘোষক: প্রাজ্ঞব্যক্তিদের মতপার্থক্যের কারণে কথালাপ এখানেই শেষ হল। এখন শুনবেন বীণায় দেশ রাগের আলাপ। শিল্পী নারদমুনি।

অনু ঘটক

ডুয়ার্সের বই। রংরুট-এর বই

আমাদের বইপত্র এখন নিজের ঠিকানাতেই পেতে পারেন

বিষয় ডুয়ার্স

ডুয়ার্স বেস্ট সেলার

তিস্তা - উৎস থেকে মোহনা। অভিজিৎ দাশ। ২৫০ টাকা
ডুয়ার্স থেকে দিল্লি। দেবপ্রসাদ রায়। ১৫০ টাকা ***
চায়ের ডুয়ার্স কী চায়? গৌতম চক্রবর্তী ১১০ টাকা
ডুয়ার্সের চা অবলুপ্তির পথে? সৌমেন নাগ। ১৫০ টাকা ***
আলিপুরদুয়ার। প্রদোষ রঞ্জন সাহা সম্পাদিত। ২৫০ টাকা
কোচবিহার ২য় সংস্করণ। প্রদোষ রঞ্জন সাহা সম্পাদিত। ২৫০ টাকা
জলপাইগুড়ি। প্রদোষ রঞ্জন সাহা সম্পাদিত। ৩০০ টাকা

ডুয়ার্সের গল্প সংকলন

ডুয়ার্সের গপ্পোসপ্পো। সাগরিকা রায়। ১৫০ টাকা
চারপাশের গল্প। শুভ্র চট্টোপাধ্যায়। ১০০ টাকা ***
লাল ডায়েরি। মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য। ১৫০ টাকা ***
সব গল্পই প্রেমের নয়। হিমি মিত্র রায়। ১৬০ টাকা

ডুয়ার্সের পেপারব্যাক সিরিজ

ডুয়ার্সের দশ উপন্যাস। সংকলন। ১৯৫ টাকা
তরাই উৎরাই। শুভ্র চট্টোপাধ্যায়। ১৬৫ টাকা
লাল চন্দন নীল ছবি। অরণ্য মিত্র। ১১০ টাকা
শালবনে রক্তের দাগ। ১২৫ টাকা
অন্ধকারে মৃত্যু-আলিঙ্গন। বিপুল দাস। ৫৫ টাকা
মেঘের পর রোদ। মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য। ৫৫ টাকা
কুহুলিয়াদের দেশে। সুকান্ত গাঙ্গুলী। ৫৫ টাকা

ডুয়ার্সের কাব্য চর্চা

পঞ্চাশ পর্যটন শেষে মাধুকরী ধান। অমিত কুমার দে। ২৫০ টাকা
ডুয়ার্সের হাজার কবিতা। অমিত কুমার দে সম্পাদিত। ৫০০ টাকা
বোধিবৃক্ষ ছুঁয়ে এক চির ভিক্ষুক। অমিত কুমার দে। ২৫০ টাকা

বিষয় পর্যটন

আমাদের পাখি।
তাপস দাশ ও উজ্জ্বল ঘোষ। ৪৯৫ টাকা
সিকিম। সংকলন। ২০০ টাকা ***
নর্থ ইস্ট নট আউট।
গৌরীশংকর ভট্টাচার্য। ১৫০ টাকা
রংরুটে হিমালয় দর্শন।
সংকলন। ২০০ টাকা ***
উত্তরবঙ্গের হিমালয়ে।
প্রদোষ রঞ্জন সাহা। ২০০ টাকা ***
সব্যসাচীর সঙ্গে জলে জঙ্গলে। সংকলন
১৫০ টাকা ***
মধ্যপ্রদেশের গড় জঙ্গল দেউলে।
সুভদ্রা ঊর্মিলা মজুমদার। ২০০ টাকা ***
সুন্দরবন অনধিকার চর্চা।
জ্যোতিরিন্দ্রনারায়ণ লাহিড়ী। ১৫০ টাকা ***

প্রাণের ঠাকুর মদনমোহন। তন্দ্রা চক্রবর্তী দাস। ১১০ টাকা
জয় জল্লেশ। শুভ্র চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত। ৯০ টাকা

অরণ্য কথা বলে।
শুভ্রকান্তি সিনহা। ১৫০ টাকা ***
সে আমাদের বাংলাদেশ।
গৌতম কুমার দাস। ২০০ টাকা
পাসপোর্ট প্রতিবেশিদের পাড়ায়।
দীপিকা ভট্টাচার্য। ১৫০ টাকা ***
তিন মহাদেশ দশ দিগন্ত।
শান্তনু মাইতি। ১৭৫ টাকা

বাড়িতে বসেই অর্ডার দিন আমাদের বই। পেয়েও যাবেন নিজের ঠিকানাতেই।

হোয়াটসঅ্যাপ করুন ৬২৯৭৭৩১১৮৮ নম্বরে

ন্যূনতম ৩০০ টাকার অর্ডার দিতে হবে। ৫০০ টাকা বা তার বেশি অর্ডার দিলে ডিসকাউন্ট মিলবে ২০%।
পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে কোনও ঠিকানায় ক্যুরিয়ার খরচ লাগবে না।

আমাদের বই যে সব দোকানে পাওয়া যায় (বই না পেলে অর্ডার করুন)

কলকাতা: দে'জ ও দে বুক স্টোর, কলেজ স্ট্রিট। **রিড বেঙ্গলি বুক স্টোর** ৪২ এ সর্দার শংকর রোড, কলকাতা ২৯। ফোন ৮১০০৯০৫৫৬৬
শিলিগুড়ি: বিশ্বাস বুক এজেন্সি, হিলকার্ট রোড বাটা গলি। **জলপাইগুড়ি: ভবতোষ ভৌমিক** কমার্স কলেজের বিপরীতে **আলিপুরদুয়ার: ম্যাগাজিন সেন্টার** কলেজ হল্ট। **কোচবিহার: দাস নিউজ এজেন্সি** বড় পোস্টাপিসের বিপরীতে। **ফালাকাটা:** পাঞ্চজন্য। **মালবাজার: বইঘর**, আদর্শ বিদ্যাপীঠের উল্টোদিকে। **বিন্নাগুড়ি:** সিটি বুক স্টল। **বানারহাট:** গ্রন্থ ভারতী। **বীরপাড়া:** পোকিসা। **মালদা:** পুনশ্চ। **রায়গঞ্জ:** ধানসিঁড়ি।

*** প্রায় নিঃশেষিত

অনলাইনে কিনুন আমাদের বইপত্র www. readbengalibooks.com

সম্মাননা ! মানেই দায় বাড়ল ! মানেই বাড়ল চ্যালেঞ্জ !

পরপর দু'দিন দু' রকমের সম্মাননা জুটল 'এখন ডুয়ার্স'-এর শিকেয়। পত্রিকা সম্পাদক প্রদোষ রঞ্জন সাহাকে 'ডুয়ার্স মিত্র ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড' দিলেন 'হিমালয় ওয়ার্ল্ড মিউজিয়াম'। ১৮ মে বিশ্ব মিউজিয়াম ডে-তে বাগডোগরার ভুট্টাবাড়িতে এক মনোরম বৈকালিক অনুষ্ঠানে এই স্মারক তুলে দিলেন সংস্থার কর্ণধার ডঃ ওমপ্রকাশ ভারতী। উত্তর-পুবের হিমালয় অঞ্চলে মানব সম্পদ নিয়ে যারা কাজ করছেন তাঁদেরকেই দেওয়া হয় এই সম্মান। যা টিম 'এখন ডুয়ার্স'-কে উদ্বুদ্ধ করেছে সন্দেহ নেই।

পরের দিন অর্থাৎ ১৯ মে, ভাষা শহীদ দিবসকে মনে রেখে, উত্তরবঙ্গের অন্যতম লিটল ম্যাগ 'চিকরাশি' আয়োজন করেছিলেন সম্বর্ধনার। এ বছর চিকরাশি সম্মান লিটল ম্যাগের দুনিয়া থেকে পেলেন ইসলামপুরের মনোনীতা তাঁর 'দাগ' পত্রিকার জন্য। আর সম্ভবত এই প্রথম কোনও বাণিজ্যিক পত্রিকার প্রকাশক-সম্পাদককে সম্মাননা জানালেন 'চিকরাশি' পত্রিকা। ধুপগুড়ি জেলা পরিষদ বাংলোর সভাকক্ষে 'এখন ডুয়ার্স' সম্পাদক প্রদোষ রঞ্জন সাহা-র হাতে সেই স্মারক তুলে দিলেন পত্রিকার ডুয়ার্স ব্যুরো প্রধান শুভ্র চট্টোপাধ্যায়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উমেশ শর্মা, নিখিলেশ রায়, সঞ্জয় সাহা প্রমুখ গবেষণা ও সাহিত্য জগতের মানুষেরা।

প্রদোষ রঞ্জন সাহা তাঁর বক্তব্যে জানালেন, কৈশোরে লেখালেখি ছাপাছাপির জগতে তাঁকে নিয়ে এসেছিলেন 'চিকরাশি'-র সম্পাদক অমিত কুমার দে, আবার দীর্ঘ তিন দশক কলকাতায় বসবাসের পর ফিরে এলে 'এখন ডুয়ার্স' করার প্রেরণা জুগিয়েছিলেন সেই বাল্যবন্ধুই। অর্থাৎ লিটল ম্যাগই জন্ম দেয় বিগ বাণিজ্যিক ম্যাগাজিনের —সেই সত্য আবার প্রমাণিত হল।

নিজস্ব প্রতিবেদন

PRINTER & PUBLISHER : PRADOSH RANJAN SAHA. On behalf of owner Mr. Pradosh Ranjan Saha, printed at Albatross Graphic Solution Pvt. Ltd., published at 3 Rajdanga Gold Park, Kolkata 700107, Editor - Pradosh Ranjan Saha.